দেয়ালের দেশ

সৈয়দ শামসুল হক

সূচিপত্র

১. লঞ্চ থেকে নেমে 3

২. নৌকোর ভেতর থেকে ফারুক 8

৩. আমিনবাগের এই এলাকা....................14

৪. ফারুক হঠাৎ জেগে উঠল 23

৫. সামনের বাগানে ছোট ছোট 26

৬. এর প্রায় ছমাস পরের কথা....................36

৭. হপ্তা দেড়েক আগে সেদিন 50

৮. সকালে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢেলে....................71

৯. আশরাফ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে 80

১০. বিকেল যখন হয়ে এলো....................99

১১. পেট্রোম্যাক্স নিভে গেছে....................105

১২. দূর থেকে দেখেই খোকা দৌড়ে এলো....................119

১৩. এ কাহিনীর শেষ এখানেই নয়....................135

১৪. বাসা নিয়েছে ফারুক 152
১৫. সেদিন ছিল ছুটি....................158
১৬. তাহমিনা চলে যাবার পর....................168
১৭. কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা....................172
১৮. জানালার পর্দা সরানো কিছুটা....................186

১. লঞ্চ থেকে নেমে

লঞ্চ থেকে নেমে যখন নৌকোয় উঠল ফারুক, বেলা তখন পড়তি পহর। তেঁতুলিয়ার শাখা নদী আঁধার হয়ে আসছে। ইলশাঘাটা, লাখুটিয়া, উলানিয়ার নৌকো দুরন্ত পাড়ি জমিয়েছে। কেউবা মাঝরাতে, কেউবা ভোর রাতে পৌঁছবে।

সে তুলনায় ফারুক যাবে অনেক কাছে। টিম্বার মার্চেন্ট আবিদের বাংলোয়। হয়ত ঘন্টা তিনেকও লাগবে না স্রোত পেলে। নদী এখানে অনেক শান্ত। আকাশের দিগন্ত অবধি তার। বিস্তারই শুধু, কিন্তু দক্ষিণের মত জোয়ারের পাহাড়–ঢেউ ওঠে না এদিকে। দেখতেই যা। বিশাল। ছোট ছোট নৌকো নিয়ে এমনকি বাচ্চা ছেলেরাও পাড়ি দিয়ে ওপারে যায়। খেলনার মত তাদের নৌকো দেখে বুকে ভর করে ভয়। কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের কাছে এ তুচ্ছ। নদী আর অরণ্যের সাথে সংগ্রামই তাদের জীবন। কিন্তু ফারুকের কেমন ভয় ভয় করে। আচ্ছা, এদিকে কি নৌকোডুবি হয় না? ধরো, আজকেই যদি অমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে? ফারুক ছইয়ের ভেতরে পাটাতনে শুয়ে ভাবছিল। চোখ বুজলো। খানিকটা অবসাদে, খানিকটা হয়ত ভয়ে।

অথবা সে শুনেছে এদিকে নাকি নৌকোয় ডাকাতি হয়। বড় বড় জাঁদরেল পুলিশ সায়েবেরাও নাকি তাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান। সে কথা মনে করলে গায়ের নোম খাড়া হয়ে ওঠে।

ফারুক হাতের আঙটি দুটো নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবে, না এলেই সে পারত। বেশতো ছিল সে ঢাকায়। সব কিছু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আজ তিনবছর বাদে সেই ভুলে যাওয়া অতীতটাই তাকে যে এখানে টেনে আনবে তা কে জানতো? তাহমিনাকে তিনবছর আগেই ভুলে যেতে চেয়েছিল ফারুক।

তাহমিনার এতদিন পরে হঠাৎ আসা এক চিঠিতে এমন করে না বেরিয়ে পড়লেও চলতো। তাহমিনা লিখেছে, "এতদিন বাদে তোমাকেই লিখছি বলে অবাক হয়ো না ফারুক। তোমাকে আমি জানি। যদি কোনোদিন আমাকে তুমি তোমার বলে ভেবে থাকো, তাহলে এ চিঠিকে তুমি উপেক্ষা করবে না, এ আমি জানি। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। চিঠি পাবার সাথে সাথে এখানে চলে আসবে। জরুরি কাজ। আমার দিব্যি রইল, আসবে নিশ্চয়ই। পথের নিশানা নিচে লিখে দিচ্ছি। তাছাড়া আমাদের বাংলো এ অঞ্চলের সব মাঝিই চেনে। যতো কাজই তোমার থাক, তুমি আসবে ফারুক।"

তাহমিনাদের বাংলো এ নায়ের মাঝিও চেনে।

কিন্তু কী এমন বিপদ তাহমিনার? আর ফারুকই বা কী করতে পারে? একথা শুধু এখন নয় ঢাকা থেকেই মনে হয়েছে তার। কিন্তু না এসে পারে নি।

চিঠিটা যেদিন পেয়েছিল সেদিন অনেক রাতে ফারুক তার সুটকেসটা খুলেছিল। তাহমিনা কবে তাকে একটা ছবি দিয়েছিল। খুঁজে পেল না সেটা। ছবি দেয়ার ইতিহাসটা

আজো তার মনে আছে। ফারুক একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহমিনাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিল বাগানে বিরাট এক সূর্যমুখীর সোনালির দিকে দেখিয়ে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়, তাহমিনা। তাই?

হ্যাঁ। এই অন্ধকারের মতই আমার চারদিকে অন্ধকার; আর তুমি যেন সেই অন্ধকারে সূর্যমুখীর মত।

বার থেকে বুঝি তাহমিনার বাবা কামাল সাহেব ফিরলেন। ওধারের বারান্দা থেকে তার ডাক শোনা গেল, মিনু, মিনু মা কইরে?

তাহমিনা বলেছিল, বাবা বুঝি পেশেন্ট দেখে ফিরলেন। যাই আমি।

যাবে?

বাঃ! বাবা ডাকছেন যে।

তাহমিনা চলে গেছ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল ফারুক। হয়ত ও আর শীগগির আসবে না। এখুনি হয়ত কামাল সাহেব চা করতে বলবেন ওকে। তাহমিনাকে না হলে কামাল সাহেবের একদণ্ড চলে না।

কিন্তু তাহমিনা ফিরে এসেছিল একটু পরেই প্রায় দৌড়ে। বলেছিল, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি চলে গেল। তারপর একটু থেমে, বলোত আমার হাতে কি?

ফারুক একটু ভাবল। কিন্তু তার আগে ও নিজেই উত্তর করল, ছবি। আমার ছবি। সেদিন আমরা সবাই স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিলাম। একটা গ্রুপ, আর সবার একটা করে। বাবা প্রিন্ট নিয়ে এলেন এই মাত্তর।

তাহমিনার হাত থেকে ফারুক কেড়ে নিল খামটা। একটু আলোর দিকে সরে বেছে বেছে বের করল তাহমিনার একলা ফটোর তিনটে প্রিন্ট।

তারপর বলল, একটা নিলাম। কাছে রাখব।

তাহলে আর এসো না। ছবিই দেখো। ছবি তো পেলে।

আচ্ছা তাই হবে। আসবো না। যদি তাই চাও।

সেই থেকে ছবিটা ফারুকের সুটকেশে। সে আজ পাঁচ বছর আগের কথা কী তারো বেশি হবে হয়ত।

সেদিন চিঠি পেয়ে রাতে সুটকেশটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল ফারুক। কিন্তু ছবিটা পাওয়া যায়নি। অবশেষে তার মনে পড়ল, একদিন সে নিজেই ওটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে

ফেলে দিয়েছিল। আর খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়েছিল তাহমিনার আরো দুটো স্মৃতিচিহ্ন। একটা সেলুলয়েডের ছোট্ট স্বচ্ছ কেসে রাখা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মধুমল্লিকা। ফারুকের সাথে সন্ধি করে একদিন তাহমিনা দিয়েছিল। কেসের ভেতরে চ্যাপটা আর ম্লান হয়ে গেছে ফুল। বিবর্ণ হয়ে গেছে পাপড়ি। ধূসর হয়ে এসেছে। আর তার পাশে একটা কাগজের টুকরো। যার একপিঠে গোটা গোটা অক্ষরে একদিন তাহমিনা লিখে দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার কটা লাইন—-

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে।

লেখাগুলো আজো উজ্জ্বল ফারকের মনে হয়েছিল, ভালো করে কান পাতলে, আর বাইরের সমস্ত স্বর আর ধ্বনি থেমে গেলে, বুঝি আজো তাহমিনার সুরেলা গলায় সেই আবৃত্তি শুনতে পাওয়া যাবে।

২. নৌকোর ভেতর থেকে ফারুক

নৌকোর ভেতর থেকে ফারুক আস্তে আস্তে বাইরে এসে বসলো। কিছুই ভালো লাগছিল না। তার। বেলে জ্যোছনা ছড়িয়েছে আকাশে। আর সেই আলো–আঁধারে নদীর ওপার হয়ে এসেছে আবছা। মিশে গিয়েছে আকাশের সাথে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বার–দরিয়া দিয়ে নৌকো চলেছে।

এমনি করে আরো ঘণ্টা দুয়েক যেতে হবে। ফারুক একটা সিগারেট ধরিয়ে মাঝিকে শুধালো, কী নাম তোমার?

ইয়াসিন, হুজুর

আচ্ছা ইয়াসিন, এ নদীতে কুমির নেই?

আছে হুজুর। একটু থেমে বলল, কেন আপনার ডর করে নাকি? ডরের কী আছে?

না, না। এমনি বলছিলাম ইয়াসিন।

কিছুক্ষণ শুধু দাঁড় টানার শব্দ। কোথাও বুঝি মাটির ধ্বস ভেঙে পড়ল অনেক দূরে। ইয়াসিনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কপালের ছায়া এসে পড়েছে চোখের ওপর। চোখের ভ্রূ প্রায় পেকে গেছে তার। মাথায় শুধু দুএক গাছি অগোছাল সাদা চুল। গালে

খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বয়সের নিষ্ঠুর ছাপ তার মুখে আর সারা দেহে। কুঁজো হয়ে গেছে পিঠ। দাঁড় টানার। সাথে সাথে বাহুর মাংসপেশী মোটা কাছির মত ফুলে উঠে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ইয়াসিন খানিকটা যেন আপন মনেই বলল, আমাদের সায়েবের কিন্তু কুমির শিকারে ভারী নেশা।

কোন সাহেব? আবিদ?

ফারুক একটু উদ্বেগভরা গলায় শুধালো।

ইয়াসিন খানিকটা সলজ্জ হেসে উত্তর করল, গরিব মানুষ, সায়েবের নামে কি দরকার হুজুর?

কেন খুব রাগী বুঝি উনি?

ইয়াসিন হেসে মাথা নাড়ল। বলল, না, তওবা তওবা। এই তো সেদিন তার বোটমাঝির অসুখ বলে আমার নায়ে করে বেরিয়েছিলেন শিকার করতে।

হঠাৎ তাহমিনার কথা জিজ্ঞেস করতে লোভ হলো ফারুকের। শুধালো, তোমাদের মেমসাব যান না?

না, হুজুর। বড় ভর করে নাকি ওনার। সায়েবকে তো উনি কিছুতেই বেরুতে দেন না বন্দুক নিয়ে।

ইয়াসিন বলে চলল তাহমিনার এই ডর করার উপাখ্যান।

একদিন নাকি, কথাটা সে শুনেছে আবিদের বোটমাঝি গফুরের কাছ থেকে, ভোর সকালে উঠেই আবিদ বলেছে শিকারে যাবে। কুমির না, আজ দূর চরে পাখি শিকার করবে সে। তাহমিনাও সাথে যাক এই তার ইচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই যেতে চায়নি ও। আবিদের একটা কথা একটা অনুরোধও শোনেনি। এরপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে আবিদ, এসে দাঁড়িয়েছে বাংলোর বারান্দায়। সেখানে আবদুল টোটার বেল্ট আর হ্যাট হাতে দাঁড়িয়ে। আবিদ বেল্ট আড়াআড়ি মাথার ভেতর দিয়ে গলিয়ে স্ট্যাপ বেঁধে হ্যাট তুলে নিয়েছে তারপর কী ভেবে আবার ফিরে গেছে শোবার ঘরে! সেখানে তাহমিনা রাতের বাসি বিছানা ভাঁজ করে রাখছিল। পায়ের শব্দে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছে ও। আবিদ বলেছে, তাহলে তুমি যাবে না?

এ কথার কোন উত্তর দেয়নি তাহমিনা।

বেশ, যাচ্ছো না বুঝতে পারছি। কিন্তু মুখে সেটা বলতে বাধে নাকি? তুমি কী—-

ইয়াসিন এখানে বলল, গফুরও ভালো করে জানে না কি কথা হয়েছিল। খানিকক্ষণ বাদেই আবিদ গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসেছে। সেদিন এলোপাথারি শিকার করেছে সে।

রেঞ্জের ভেতরে যা কিছু এসেছে স্থির নিশানা করে ট্রিগার টিপেছে। এমনি করে চর থেকে চরে সমস্ত টোটা শেষ করে বোটে এসে ধপ করে বসে বন্দুক ফেলে বলেছে, বোট ছাড়, গফুর।

হুজুর, পাখিগুলো?

আবদুল আর গফুর গুলি খাওয়া সব পাখি এনে পাড়ে জড় করে রেখেছিল। গফুর সেদিকে আঙুল তুলে ভয়ে ভয়ে শুধালো। আবিদ বলেছে, আজ ওগুলো সব তোদের দিলাম। নিজেরা যা পারিস রেখে গায়ে বিলিয়ে দিস আমার নাম করে।

সেদিন আমরা খুব খেয়েছি হুজুর ওনার কৃপায় ইয়াসিন একটু হেসে বলল। এখনো যে কটি দাঁত তার অবশিষ্ট আছে অন্ধকারে তাই চকচক করে উঠল। কিন্তু তারপরেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে এলো সে। ভারী গলায় বলল, মেমসাব আমাদের খুব স্নেহ করেন হুজুর। বলতে কী মায়ের ব্যবহার পাই তার কাছ থেকে। কোনদিন দোরে হাত পেতে ফিরিনি। ভাবি. কোনদিন হাসতে দেখি না কেন ওকে! তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, থাক ও সব কথা, আমরা গরিব মানুষ দিন আনি দিন খাই ও আমাদের ভেবে ফায়দা নেই হুজুর।

ফারুক চুপ করে শুনলো। তার হাতের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, নতুন আর একটা ধরালো এবার! ভাবলো হয়ত ওর কাছে জিজ্ঞেস করে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।

কী হয়েছে ওদের? পরমুহূর্তেই ভালো, না থাক। এতখানি কৌতূহল দেখানো হয়ত ভালো হবে না। কিন্তু শেষ অবধি না শুধিয়ে পারল না।

আচ্ছা ইয়াসিন, তোমাদের সায়েবের কিছু হছে, জানো তুমি?

কই নাতো। আর জানবোই বা কী করে? দেড় হপ্তা ধরে অসুখে বেহুস হয়ে ছিলাম। গতর খাঁটিয়ে খাই। আজকেই মাত্তর নাও নিয়ে বেরিয়েছি। পয়লা কেরায়া এই আপনি কই শুনিনি তো কিছু।

ও।

কেন, খারাপ কিছু নাকি?

উঁহু না, এমনি। ফারুক কথাটা সহজ করে দেবার জন্য ঘুরিয়ে মিছে বলল, অনেকদিন কোনো খবর পাইনে, তাই।

আল্লা মালেক।

ইয়াসিন নদীর একটা বাঁক পেরুলো। বোধহয় অর্ধেকটা পথ এসে গেছে তারা।

বাইরের বাতাস কেমন ঠান্ডা আর তীব্র। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ফারুক ছইয়ের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানাটা পেতে নিয়েছিল নৌকোয় উঠেই। এখন আলস্যে গা এলিয়ে দিল। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে একটু আকাশ। জ্যোছনাটা ভারী মিষ্টি। অপলক, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়।

ফারুক সেদিকে তাকিয়ে রইল। পিঠের নিচে তরল নদীর স্রোত আর ঢেউ ভাঙার একটানা শব্দ। দূরে আকাশে একজোট কয়েকটা তারা দুলছে।

৩. আমিনবাগের এই এলাকা

এই সেদিন অবধি আমিনবাগের এই এলাকা ছিল পাড়াগাঁর মতন। কাঁচা রাস্তা। কলার ঝোঁপ, কাঁঠালের গাছ। এখন সেখানে নতুন পীচের রাস্তা হয়েছে। রাতারাতি উঠেছে দালান কোঠা। রাজধানী ঢাকা এখন প্রসারিত এই আমিনবাগ অবধি। দোতলা হলুদ জাপান কনসুলেট পার হয়ে রাস্তাটা ঘুরে চলে গেছে মতিঝিল কলোনির ভেতর। সকাল দুপুর বিকেল সবসময়েই এলাকাটা কেমন নিঝুম নিঃশব্দ হয়ে থাকে।

পার্টিশনের পর পরই এই এলাকায় জমি কিনে ছোট্ট একতলা বাড়ি করেছিলেন তাহমিনার বাবা ডাঃ কামাল আহমেদ। সামনে অনেকটা জমি। সেখানে বাগান। তেকোণ ইটের বৃত্তের মাঝখানে একটি কী দুটি গোলাপ ফোঁটা গাছ, মধুমল্লিকা, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, আরো কত কী। একদিকে একটা শিশু খেজুরের চিকচিক সরু সবুজ।

একধারে গ্যারেজ। আসমানি রঙের মরিস মাইনরে করে পেশেন্ট দেখতে বেরোন কামাল সাহেব। তাহমিনা যায় ভার্সিটিতে। বড় ছেলে জাকি যায় অফিসে। কখনো কখনো মেজ ছেলে লাবলু চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায় এই মরিসে করে। গেল বছর পাশ করে অবধি লাবলু এখনো বসে আছে। তাকে, কামাল সাহেব বলেন—- হবে, হবে, সবই হবে, অত তাড়াহুড়ো করতে নেই। লিলির স্কুল থেকে বাস আসে। বাসে করেই যায় সে। মালেকাবাণু খুব কম বেরোন গাড়িতে। তবুও গাড়িটার বিরাম নেই। চব্বিশ ঘণ্টা চলার ওপরেই আছে। ভোর সকালেই দিনকার খবরের কাগজ হাতে করে মরিসে গিয়ে বসেন কামাল সাহেব। বাসায় বসে পড়বার মত সময়ও তার হয় না। ফেরেন দুপুরে

একঝলকের জন্যে। তারপর সেই যে যান, আসতে আসতে রাত নটা দশটা। তাই সংসারের সবকিছু, সব ভার মালেকাবাণুর হাতে। রান্না থেকে শুরু করে ড্রয়ার থেকে খরচের টাকা বের করে নিখুঁত হিসেব রাখা থেকে, জাকি আর লাবলুর মনমত রঙ জেনে বিছানার বর্ডার সেলাই করা অবধি সব কিছু সারাদিন করেন তিনি। ওটা ফুরুলো, এটা আনতে হবে; অমুকের অমুক দরকার; আজ লাবলুর গোটা দশেক টাকা দরকার; তাহমিনা নতুন একটা শাড়ি দেখে এসেছে সব যেন মালেকাবাণুর জানবার কথা। সব যেন তারই করবার কথা। অথচ এতটুকু অভিযোগ নেই কোনোখানে। এত চুপচাপ থাকেন যে, তিনি যে আছেন তা চট করে অনুভব করা যায় না। অথচ না থাকলে মনে হয় কোথায় যেন কি নেই।

মালেকাবাণুকে দেখে প্রথম দিনই ফারুক মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাহমিনা বলেছিল, আমার মার মত আর দুটি মা হয় না। দেখবে তোমাকে কত আদর করেন উনি।

ফারুক পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলেছিল, আপনার কথা ওর মুখে অনেক শুনেছি খালাআম্মা। কেউ দেখিয়ে না দিলেও চিনতে আমার এতটুকু কষ্ট হতো না।

উত্তরে মালেকাবাণু হেসেছিলেন। বসতে দিয়েছিলেন নিজের হাতে শেলাই করা আসন পেতে। তারপর একটা পিরিচে করে ফল কেটে এনে দিয়েছিলেন।

তোমার সাথে আলাপ হয়ে ভারী খুশি লাগল ফারুক। উনি এখনো ফেরেননি, নইলে দেখতে এতক্ষণ ওর সাথে বসে গল্প করতে হতো তোমায়।

কেন খালাআম্মা?

ফারুক গ্লাশ নাবিয়ে রাখল। তাহমিনা বারান্দায়, এখান থেকেই তার শাড়ির মৃদু ভাঁজ ভাঙার শব্দ আসছিল। মালেকাবাণু বললেন, জানো না, সেদিন আমরা সবাই তো তোমাদের নাটক দেখতে গিছলাম। তাহমিনার সাথে যে তুমি অভিনয় করবে তা আমরা আগেই ওর কাছ থেকে শুনেছিলাম।

ও। ফারুক সলজ্জ হাসলো, বলল, কেমন লেগেছিল?

ভালো, খুব ভালো। উনিও তোমার কথা বলছিলেন সে রাতে।

তাই নাকি? সে আমার সৌভাগ্য।

এমন সময় বাইরে কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। এক জোড়া জুতোর হালকা ছন্দময় ধ্বনি। ফারুক হঠাৎ কথা থামিয়ে কান পাতল। মালেকাবাণু গ্লাশ আলমিরার তাকে রাখতে রাখতে বললেন, জাকি ফিরল। মিনুর বড় ভাই। বার্মাশেলে ভালো মাইনেয় কাজ করছে। অফিস থেকে এলো।

ও। তারপর একটু থেমে বলল, লাবলু কোথায়? বাসায় নেই?

ওমা, তুমি সবাইকে চেনো দেখছি।

ফারুক যেন লজ্জিত হলো। মাথা নিচু করল একটু। উনি বললেন, কোথায় আড্ডা মারছে কে জানে। পাশ করে অবধি তো ঐ এক কাজ তার। বাবুর এখন একটা কাজ হলেই বাঁচি। হয়ে যাবে শীগগিরই। আজকাল কাজ পেতে অমন একটু আধটু দেরি হয়ই খালাআম্মা।

লাবলুকে দেখেছ তুমি ফারুক?

না।

দেয়ালে একটা ফটোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, অই তার ছবি। আর এদিকেরটা জাকির।

ফারুক সেদিকে তাকিয়ে বলল, লাবলু কিন্তু ঠিক আপনার মত দেখতে হয়েছে।

বলো কি, ছবি দেখেই? মালেকাবাণু স্নেহের এবং হয়ত একটু আত্মগর্বের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, তুমি একটু বসো, আমি পিরিচ রেখে আসিগে।

আচ্ছা।

ফারুক চুপচাপ বসে আসনে নখের আঁকিবুকি কাটতে লাগল। এমন সময় বারান্দায়, দোরপর্দার একটু দূরে, কার গলা শুনতে পেল সে। হয়ত জাকির স্বর। তাহমিনাকে বলছে, লোকটা কে রে মিনু?

জাকির প্রশ্নের সুরটা কেন যেন ভালো লাগল না ফারুকের। একটু অস্বস্তি বোধ করল সে। নড়েচড়ে পিঠ সোজা করে বসলো। আর তার প্রশ্নের উত্তরে তাহমিনা নিচু গলায় কি বলল তা ভালো করে শুনতে পেল না। কিন্তু পরক্ষণেই জাকির গলা আবার শোনা গেল, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। তাই বলে বাসায় আনবি? যা খুশি তাই করগে।

কী বকছ, দাদা। আস্তে বলো, শুনবে ও।

পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল জাকি সাথে সাথে চলে গেল। তারপরেই পাশের কামরা থেকে গুনগুন শোনা গেল তার। হয়ত কাপড় বদলাচ্ছে জাকি। একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলো। তাহমিনা। ভার্সিটি থেকে যখন দুজনে বেরিয়েছিল, তখন ওর পরনে ছিল অসম্ভব নীল রঙের বিনিপাড় শাড়ি। মাথায় নীল টেপ। দুদিকে বিনুনি করা। আর পায়ে সমতল হালকা স্ট্রাপ দেয়া স্যাণ্ডেল। এখন সে তা বদলে ফেলেছে। শুধু সাদা একটা শাড়ি। চওড়া ফ্যাকাশে লালপাড় দেয়া। মাথার সেই বিনুনি খুলে ফেলেছে। ঢেউয়ের মত একরাশ চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। মুখের মিহি প্রসাধনটুকু মুছে গিয়ে এখন সেখানে শুধু শুভ্রতা। তাহমিনা এসে ঠিক মাঝখানে দাঁড়াল ক্ষণেক। ফারুক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাহমিনা বলল, কই আমাদের বাড়িটা কেমন বললেন না তো?

ভারী নিরিবিলি। আরো বলব? আশ্চর্য গোছানো। থাকতে ইচ্ছে করে। শেষের কথাগুলো বলল নিচু গলায়।

তাহমিনা একটু এগিয়ে এলো, তাই নাকি? আমার কিন্তু মোটেই পছন্দ হয় না।

কেন?

তাহমিনা দূরে চৌকির বাজু ধরে বসে বলল, ইতস্তত কপট সুরে, যা নিরিবিলি। একটু যদি পড়তে পারা যায় মন দিয়ে।

অবাক করলেন। ফার্স্ট ইয়ারে এসেই পড়াশোনা?

কেন না? ইংরেজি অনার্স কি খুব সোজা নাকি?

মোটেই না, মোটেই না।

ফারুক মাথা দোলালো হাসতে হাসতে। তারপর বলল, যাই বলুন, আমি নিজে থার্ড ইয়ারে উঠেও কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারছি না। কেমন যেন হতেই চায় না।

তাহমিনা একটু উদ্বেগভরা স্বরে বলল, পাশ করবেন কী করে? মানে, ফার্স্টক্লাশ নিতে হবে তো?

দরকার নেই আমার।

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মালেকাবাণু। শুধালেন, কি দরকার নেই ফারুক?

পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস, খালাআম্মা।

কেন?

মালেকাবাণু এসে আবার বসলেন ফারুকের সাথে কথা বলতে। আর তাহমিনা প্রায় সারাক্ষণ চুপ করেই রইল বসে। সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের রাস্তা। বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল হয় উঠেছে। পথের পীচ দেখাচ্ছে কেমন নীলাভ। কেউ কেউ হাঁটছে। একটা দামি মোটর বেরিয়ে গেল। চারদিকের বাতাসে কোন মিষ্টি ফুলের গন্ধ।

আরো কিছুক্ষণ পরে ফারুক উঠল। মালেকাবাণু আবার একদিন আসতে বলে দোর অবধি এগিয়ে এলেন। আর গেট অবধি এগিয়ে দিতে এলো তাহমিনা একেলা। গেটের এ পাশে। দাঁড়িয়ে সে বলল, এসে কিন্তু মার সাথেই শুধু গল্প করে গেলেন। ভারী স্বার্থপর আপনি। তাই নাকি! জানা ছিল না আমার।

এক মুহূর্ত দুজনে চুপ। ছোট্ট লিলি বাইরে থেকে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। একবার তাকাল দুজনার দিকে। তাহমিনা শুধালো, কোথায় গিছলি রে? সারা বিকেল পাত্তাই নেই।

অইতো, রানুদের বাসায়। জানো রানুরা আজ

থাক এখন। পড়তে যা! লিলি বুঝি উৎসাহে বাধা পেয়ে ক্ষুণ্ণ হলো। বলল, বারে যাচ্ছি তো।

লিলি চলে গেল মুখ ভার করে। ফারুক হেসে বলল, মিছেমিছি মন খারাপ করে দিলেন বেচারির।

যা দুষ্টু। আপনার কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হলো আজ।

দূর। চলি তাহলে।

আচ্ছা।

তাহমিনা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উঠে এলো বারান্দায়। জাকি সেখানে বেতের চেয়ার টেনে দেয়াল–আলোর নিচে ইংরেজি পত্রিকা ওলটাচ্ছিল। চোখ তুলে বলল, চলে গেল নাকি?

হু।

মালেকাবাণু ঘরে উঠে আসছিলেন। তাহমিনা তাকে বলল, আচ্ছা মা, দাদা কী রকম লোক বলোত?

কেন কি হয়েছে এরি মধ্যে আবার?

তখন যে ওসব বলল, যদি শুনে থাকে, তাহলে কী ভাববে? কাল ভার্সিটিতে মুখ দেখাতে পারব?

কি বলেছে শুনি?

কি আবার বলবে? তোমার ছেলের কাছ থেকে শোনো।

তাহমিনা গটগট করে তার নিবে কামরার দিকে চলে গেল। জাকি আবার চোখ ফিরিয়ে নিল কাগজের ওপরে। মালেকাবাণু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন না কি ব্যাপার? আর তাহমিনাই বা এতক্ষণ খুশি থেকে হঠাৎ ছুতনো কথায় মুখভার করে চলে গেল কেন? কিন্তু পরমুহূর্তেই অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। যেন কী একটা হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

৪. ফারুক হঠাৎ জেগে উঠল

ফারুক হঠাৎ জেগে উঠল ইয়াসিনের কণ্ঠস্বরে! ইয়াসিন তাকে কয়েকবার ডাকল, হুজুর, হুজুর, ঘুম গেলেন নাকি?

কিছুটা সময় লাগল তার সেই ঘোর ভাঙতে। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, আচ্ছন্ন হয়েছিল। এখন চোখ মেলে তাকাল। ছইয়ের ভেতরটা কী অন্ধকার। পাশ ফিরে তাকাল বাইরে। সেই। যে তারাগুলো দুলছিল এখন তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে অনেক নিচে দিগন্তের কিছু ওপরে একটা বিরাট নিঃসঙ্গ তারা ধ্বক ধ্বক করছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার একটা রেখা। এসে বুঝি পড়েছে নদীর জলে, নৌকোর কিনার অবধি। আর ফারুক যেন কিছুই শোনেনি। ভাবতে লাগল অতীতের কথা। ইয়াসিন আবার একবার ডাকল। ফারুক এবার বলল, না, ইয়াসিন ঘুমোই নি। ভাবছিলাম। আচ্ছা আর কতক্ষণ লাগবে তোমার পৌঁছুতে?

বেশি না হুজুর। আর ঘণ্টা খানেক।

ও।

আপনি ঘুম যান। নৌকো একেবারে সায়েবের বাংলোর কাছে গিয়ে লাগবে। আপনাকে ডেকে দেব।

আচ্ছা। তুমি বাও।

ফারুক আবার শরীর শিথিল করে এলিয়ে দিল। কেমন ভার হয়ে এলো তার চোখ। স্রোতের টানে বয়ে যাচ্ছে নৌকা। আর এক বিচিত্র শিরশিব অনুভূতি সে স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল শিরায় শিরায়। কেমন ঝিমঝিম একটা সুর তরংগের মত। রাতের এই প্রহর পেরিয়ে নদীর দুই পাড় ছাপিয়ে তীরের দীর্ঘ একেকটা গাছের সারের ভেতর দিয়ে সেই সুর যেন অনন্তকাল প্রবাহিত হয়ে গেল।

ইয়াসিন দাঁড় টানছে আস্তে আস্তে। অল্প শব্দ উঠছে। এবার গুনগুন করে গান ধরল—-
"ও আমার গুরুর কথা বলবো কী,
আমার ভরিয়া গেছে দুই আঁখি।"

সেই গুনগুন এসে কোমল মূচ্ছনা তুলল ফারুকের ভেতরে। সে তন্ময় হয়ে গেল। ইয়াসিন এবার আরো স্পষ্ট করে গেয়ে উঠল,

"ও বোয় যেমন স্বপ্ন দেখে
মনের আগুন মনে রাখে
আমারও ভিতরে তেমনি–"

ক্রমে উদাত্ত হয়ে এলে তার কণ্ঠস্বর। ভারী হয়ে নামলো ফারুকের বুকের ভিতরে। সে নিঃসাড় পড়ে রইল। ডুবে গেল ক্রমে ক্রমে। ইয়াসিনের গলা যেন অনেক অনেক দূরে

সরে যাচ্ছে। একসময় বুঝি আর সে শুনতে পাবে না। ধীরে ধীরে চোখের পাতা ভার হয়ে এল তার।

৫. সামনের বাগানে ছোট ছোট

সামনের বাগানে ছোট ছোট নিচু টেবিলের পাশে রাখা চারটে করে হালকা চেয়ার। বাইরের বারান্দায় ডান দিকে বিছানো দামি কার্পেটের ওপর ধবধবে রেশমের চাদর। আর বসবার ঘরটাও আজ নতুন করে সাজানো হয়েছে। লিলির আজ দশম জন্মতিথি। তাহমিনা আর মালেকাবাণু নিজ হাতে সাজিয়েছেন সব। ফুলদানিতে বিরাট তোড়া বেঁধেছে তাহমিনা মধুমল্লিকা আর গোলাপের। জানালা দরজার পর্দাগুলো বদলে দিয়েছে। কামাল সাহেব সময় পান না মোটে। এদিকে চোখ দেবার মত অবসর তার নেই। তবু আজ বিকেলে কোথাও বেরুবেন না তিনি। বিকেলেই পার্টি হবে। মালেকাবাণুই ঘুরে ঘুরে সব ব্যবস্থা করছেন। আর এই সময় কাজে লাগছে লাবলুকে। মরিস নিয়ে হৈচৈ করে সব আনতে কুড়োতে ঠিকঠাক করতে লেগে গেছে সে।

সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে, লিলিকে দর্জির কাছ থেকে আনা নতুন ফ্রক পরিয়ে চুল বেঁধে প্রসাধন করিয়ে যখন ছেড়ে দিল তখন তাহমিনা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর বিকেল প্রায় হয়ে এলো, একটু পরেই সবাই আসতে শুরু করবে। মালেকাবাণু বললো, এবার একটু নিজকে দেখগে তুই। খেটে খেটে যে একেবারে হয়রান হয়ে গেলি।

তাহমিনা হাসতে চাইল, কিন্তু দেখাল ম্লান।

যা তুই এখন মুখ ধুয়ে চট করে কাপড় পরে নে। দেরি করিস নে। সকলে এলো বলে। তাহমিনা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। আস্তে আস্তে সাবান দিয়ে ঘষে উজ্জ্বল করে তুলল

মুখশ্রী। অলস একক বেণি বেঁধে চক্রাকারে সাজিয়ে দিল মাথার পেছনে। আয়নায় তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর সরে এসে শাড়ি পড়ল অনেকক্ষণ ধরে। ছাই–ছাই–নীলাভ রঙের শাড়ি। রূপোলি বর্ডার দেয়া। তার সাথে মানিয়ে পরল বাহুতে সোনালি রঙের কাজ করা সাদা সাটিনের উন্নত চায়না কলার চোলি।

অলস, কিছুটা উদাস পায়ে বাথরুমের দরোজা ভেজিয়ে ভেত, বারান্দা ঘুরে বাইরের বারান্দায় এসে যখন দাঁড়ালো, তখন মুখোমুখি পড়ে গেল ফার র। চোখ নামিয়ে নিচু গলায় শুধালো, কখন এলে তুমি?

এই তো এখুনি।

বোসো কোথাও।

তোমাকে আজ ভারি সুন্দর লাগছে তাহমিনা। মনে হচ্ছে দেখিনি এর আগে।

যাও। কেউ শুনবে।

ফারুক হাসল। একটু পর শুধালো, লিলি কই?

ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বোসো।

তাহমিনা চলে গেল। আর একটু পরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো লিলি। বলল, আপনি সক্কলের আগে এসেছেন কিন্তু।

তাই নাকি? বলো তো কি এনেছি?

ফারুক তার হাতের প্যাকেট পেছনে লুকিয়ে শুধালো। লিলি প্রায় গোড়ালিতে ভর করে উদগ্রীব হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। প্রেজেন্টশন টেবিলের দিকে এগিয়ে ফারুক রাখলো তার হাতের বই কখানা। তারপর লিলিকে কাছে ডাকলো। পকেট থেকে বের করলো একটা নীল কেস। উজ্জ্বল একটা লাল পাথর বসানো ছোট্ট তারার লকেট। ওপরে কালো সিল্কের চওড়া টেপ পরানো! লিলির গলায় পে বেঁধে, তারাটা ঠিক মত বসিয়ে ফারুক ফিসফিস করে বলল, কেমন হয়েছে লিলি?

ভালো।

শুধু ভালো? খুশি হওনি?

লিলি দৌড়ে চলে গেল ভেতরে। একটু পরে কামাল সাহেব ফিরলেন। জাকি ফিরলো অফিস থেকে ছুটি নিয়ে। লাবলু ফিরল মরিস নিয়ে। মালেকাবাণুর সাথে ছোট্ট দেখা হলো ফারুকের। আস্তে আস্তে বাইরের সবাই এসে গেলেন। বিকেল হলো পাঁচটা। ভরে উঠলো প্রেজেন্টশনের ছোট টেবিল।

শেষ হলো লিলির ছোট্ট জন্ম–উৎসব। বেলা এখনো পড়ে নি। ফারুক চলে যাচ্ছিল, তাহমিনা ভেতর থেকে এসে আড়ালে বলল, দাঁড়াও, আমিও বেরুবো।

আজ ওর জন্মদিন গেলো। নাইবা বেরুলে।

বড্ড বিশ্রী লাগছে ফারুক। না বেরুলে মরে যাবো। এক কাজ করো, তুমি জাপান কনসুলেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি আসছি।

মালেকাবাণুর সাথে আরেকবার দেখা করে এলো ফারুক।

কিছুক্ষণ পরেই এলো তাহমিনা।

এসো রিকশা করি।

কোথায়?

চলো না যেখানে বেরিয়ে আসা যায়। একটু নিরিবিলি।

অবশেষে মতিঝিলের জন্য রিকশা নেয়া হলো। রিকশায় উঠে তাহমিনা গলা ফিরিয়ে বলল, তোমাকে আগে আসতে বলেছি কেন জানো? ওরা বেরুতে দিত না এখন। বলে

এলাম ক্লাশের এক মেয়ের কাছে যাচ্ছি। খুব দরকার আছে। বাবা বলে দিলেন, তাড়াতাড়ি ফিরিস।

তুমি কী বললে?

বললুম আর ফিরব না। তাহমিনা মিষ্টি হাসল।

ফারুক একটু পর বলল, হেঁটে গেলেই পারতুম। বেশ হতো।

দূর, রিকশাই ভালো। ঢাকা শহরটা দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছে যে পথ চলা ভার। শুধু ভিড় আর ভিড়। রিকশাওয়ালাকে সে ভিড় সরাবার ভার দিয়ে তবু নিশ্চিন্ত মনে গল্প করা যায়। ফারুক কিন্তু এর উত্তরে কিছুই বলল না। তাহমিনা একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে তারপর চিবুকে ভাঁজ তুলে শুধালো, কি হলো তোমার, কথা বলছ না যে বড়?

না কই। কী যে বলো।

তাহমিনা ভ্যানিটি ব্যাগ খুললো। তুলে নিল একটা মধুমল্লিকা সেখান থেকে। বলল, নাও সন্ধি করলাম।

কিসের?

যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তার। এই আমার সন্ধির পতাকা।

একবার কপোলে সেই ফুল বুলোলো তাহমিনা। তারপর ফারুককে দিয়ে হেসে বলল, আশা করি পতাকার অমর্যাদা হবে না।

সে ভয় নেই তাহমিনা।

ওরা গিয়ে থামল মতিঝিলের মাঠে। সবুজ ঘাসের ওপরে এক কোণে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসলো দুজনে। সন্ধ্যে নামছে আস্তে আস্তে; পথে এখনো বাতি জ্বলে নি। দূরে দুএকটা ফ্ল্যাটে শুধু আলো দেখা যাচ্ছে। আর একটা অস্পষ্ট কোলাহল মানুষ আর যানবাহনের সুদূর ঢেউয়ের মত এসে তাদের চারধারে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ তারা বলছে না কোন কথা। যেন চুপ করে থাকাই ভালো এখন। ভায়োলেট রংয়ে আঁকা সারাটা সুনীল এখন। ফারুক বলল, জানো তাহমিনা, এই সন্ধ্যের মন–কেমন–করা এক আবছা গান আছে। কী যেন শুধু বলতে ইচ্ছে করে। করতে সাধ হয়।

কী? মৃদু কম্পিত গলায় বুঝি তাহমিনা উত্তর করল।

ঠিক কী যে বলতে চাই তা নিজেও জানিনে।

ও হাসল। মিষ্টি করে হাসল। নিস্তব্ধ দুজনে। অনেকক্ষণ পরে ফারুক উচ্চারণ করল, দেড় বছর ধরে আমরা আলাপিত। এমনি কতদিন আমরা বেরিয়েছি বেড়াতে। হেঁটে

গেছি অনেক দূর অবধি। কোনদিন রমনায়। কোনদিন সেই দয়াগঞ্জের রেল লাইন ধরে, পায়ের নিচে শহরতলির বাজার রেখে অনেক দূরে। কথা বলেছি। আমার সব কথা বলেছি তোমাকে। তাহমিনা ভ্যানিটি ব্যাগের স্ট্র্যাপ নাড়তে নাড়তে জমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি চাও ফারুক?

আমি তোমাকে ভালবাসি তাহমিনা।

আর সে কথা বলল না। কিছুই বলল না। শুধু তার বুকের ভেতরে যেন ছড়িয়ে পড়ল মিঠে ব্যথার মত একটা অনুভূতি। ফারুক চুপ করে থেকে তাহমিনার নীরবতাকে অনুভব করতে চাইল। অনেকক্ষণ পর মুখ ফিরিয়ে বলল, জানো তাহমিনা, আজ আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কেন যেন মেলা বকতে ভালো লাগছে।

তুমি বলো ফারুক! আমি কোনদিন তো না করিনি।

দেড় বছর কেটেছে আমাদের স্বপ্নের মত। কিন্তু জানো কথাও একদিন ফুরিয়ে যায়। বলবার শোনবার কিছুই আর বাকি থাকে না। তখন মুখোমুখি শুধু। আর কী জানো এমন একটা দাবি গড়ে ওঠে, আরো কাছে তাকে পাবার জন্য। তোমাকে আমি আরো ঘনিষ্ঠ করে একান্তভাবে চাই তাহমিনা। আর কতদিন কাটবে?

কী জানি!

কিন্তু তুমি আমার হও তাহমিনা। তোমাকে আমি পরিপূর্ণ করে পেতে চাই মিনু।

এই প্রথম তাকে ও ডাকল মিনু বলে।

দূরে বাঁশের বেড়া দেয়া ছোট ছোট রেস্তোরাঁয় বাজছে গ্রামোফোন। মিহি আবছা সুর আসছে ভেসে। দুপুরে আকাশ ছিল সিলভার গ্রীন। একটু আগেই কোমল ভায়োলেট। আর এখন সেখানে প্রুসিয়ান ব্লু। দুএকটা সোনালি তরার ডট। ফারুক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো তার পাশে। অনুভব করতে চাইল তার দেহের উত্তাপ। নান্নিধ্য। অনেকদূরে ইঞ্জিনের বাজল সিটি। নারায়ণগঞ্জ থেকে বুঝি ছটা চল্লিশের লোকাল আসছে। তাহমিনা আবছা গলায় উচ্চারণ করল, আমি বড় নিঃসঙ্গ ফারুক। তুমি আমাকে একেলা থাকতে দিও না।

আরো অনেকক্ষণ তারা বসে রইল সেই অন্ধকারে সবুজ ঘাসের ভিতরে। একসময়ে উঠে এলো দুজনে। কলোনির ভিতরে সোজা র্জিন পথের পাশ দিয়ে আমিনবাগের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তাহমিনা বলল, এত একেলা নিজেকে আর কোনদিন মনে হয়নি। আজ সারা দুপুর আমার কেটেছে কী নিঃসঙ্গতায়।

আমার ও মিনু। বিকেলে তোমার সাথে দেখা হবে, তবু মনে মনে উনুন এসে ভর করছিল আমার।

আমার এই নিঃসঙ্গতা তুমি মুছে দিও!

আমি তোমাকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চাই তাহমিনা। আমাকে বড় হতে হবে। তোমাকে পেয়ে আমি বড় হবো।

তাহমিনা তার উত্তরে বলল, তুমি এমনিই বড়। তোমাকে আমি বড় করব সে সাধ্য আমার নেই। সে ভার আমাকে তুমি দিও না।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ হাঁটল তারা। উঠলো রাস্তায়। হুহু করে বাতাস বইছে। বাতাসে কপালের কাছে চূর্ণচুল উড়ছে তাহমিনার। বাঁ হাতে আনমনা সে সরিয়ে দিল। ফারুক বলল, শেষ পরীক্ষা তো হয়ে গেল। এবার জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে। তুমি পাশে এসে না দাঁড়ালে, আমি জানি, হেরে যাব।

দূর, কী যে বলো।

হঠাৎ ফারুক বলল, সুর বদলিয়ে, এক কাজ করি কী বলে?

কী?

খালাআম্মাকে বলি।

কী বলবে?

তাহমিনা গতি শ্লথ করে তাকে শুধালো আয়ত চোখ দীর্ঘতর করে।

বাঃ, কী বলব জানো না বুঝি?

বলতে পারবে?

কেন পারব না? তুমি বললেই পারব। বলো না তুমি।

তাহমিনা সলাজ হেসে বলল, যাঃ ফাজিল কোথাকার! আমার লজ্জা করবে না বুঝি? তুমি যে কী।

ফারুক একথার উত্তরে তাহমিনার হাত তুলে নিল তার মুঠোয়। হাসল। প্রথমে আস্তে। তারপর একটু জোরে। আর তার মুঠোর ভিতরে জড়িয়ে রইল তাহমিনার দীর্ঘ আঙুলের উষ্ণ কোমলতা।

৬. এর প্রায় ছমাস পরের কথা

এর প্রায় ছমাস পরের কথা। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগে স্বাস্থ্যের জন্য ফারুক গিয়েছিল কক্সবাজারে মাসখানেকের জন্যে। সেখান থেকে ফিরে এসে কথাটা শুনল। কিছুই সে জানে না। তাহমিনাও তাকে জানায়নি। তাহমিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে সুন্দরবনের টিম্বার মার্চেন্ট আবিদ চৌধুরীর সাথে। আসছে মাসের পনেরো তারিখেই বিয়ে।

প্রথম যখন কথাটা শুনলো ফারুক, তখন কিছুই মনে হয় নি তার। কিছুই ভাবতে পারেনি। অবিশ্বাসও করেনি। যেন কথাটা তার জানাই ছিল। যেন সে সব কিছুই জানতো। কিন্তু সেদিন রাত্রে সে পরিষ্কার করে পাতা নিখুঁত বালিশ সাজানো বিছানায় গিয়ে শুতে শুতে অনুভব করল, হঠাৎ কোথায় যেন কী ভুল হয়ে গেছে। স্থির একপাশে মুখ ফিরিয়ে সে ভাবল। সে কিছুই ভাবতে পারল না। তাহমিনা কেন তাকে কিছুই লিখল না? এই কথা বারবার তার বুকের ভেতরে অশান্ত হয়ে রইল। একটা দম আটকানো শক্ত কিছু যেন গড়ে উঠলো ভেতরে, ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সে চুপচাপ পড়ে রইল বিছানায়, অন্ধকারে।

দুদিন বেরুলো না কোথাও। যেন তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে, আর কিছুই করবার নেই।

বারান্দায় মিষ্টি রোদে ইজিচেয়ার টেনে বসে রইল সামনের দিকে তাকিয়ে। মা এসে একবার বললেন, কিরে এখনো ভালো লাগছে না তোর?

কই নাতো। ভালো হয়ে গেছি আমি।

ফারুক হেসে উত্তর করল মার দিকে তাকিয়ে।

তাহলে বেরোস না যে কোথাও?

কোথায় আর যাবো মা? পাশ করেছি। কাজের জন্য দরখাস্ত করেছি। উত্তর না এলে আর নড়ব কোথায়?

তোর যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা। কেন দুদণ্ড বাইরে বেরুলে ক্ষতিটা কী? এমন করে বসে থাকলে শরীরটা যে ভেঙে ফেলবি বাবা।

মাত্তর দুদিন তো এসেছি। এই মধ্যেই কী বেরুবো? যেতে দাও আর কটা দিন, তারপর। মা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যান। ফারুক তার দিকে তাকিয়ে থাকে। পায়ের কাছে এখনো শূন্য চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে। বিনষ্ট। রোদে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল। কিন্তু দূরে পাচিলের ওধারে শিরীষের ডালে বাতাসের অগুনতি খুশি। না সে আর দেখা করবে না তাহমিনার সাথে। ভুলে যাবে তাকে। তাহমিনা যদি তার জীবনে না আসতো কোনদিন, তাহলে সে কী করতো? ও ভাববে এখন থেকে তাহমিনা বলে কাউকে সে কোনদিন চিনত না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো আত্মপ্রবঞ্চনা করছে সে।

না, এ তার আত্মসংযম–ফারুক ভাবলো। আর এমনি হাজারো ভাবনার ভেতরে একটা অনুভূতিই স্থির হয়ে রইল ব্যথাবিদ্ধ তারার মত, সে আজ থেকে একেলা। কোথাও যাবার নেই। করবার নেই। কথা বলবার কেউ নেই। সে নিঃসঙ্গ।

তারপর যখন দুপুর হলো শিরীষ ডালের ওপর, তখন ফারুক ঠিক করল তাহমিনার সাথে সে দেখা করবে। জিজ্ঞেস করব সঃ কিছু। চুপ করে সে থাকবে না।

একটু পরেই বেরুলো সে। মা বললেন, কিরে বেরুচ্ছিস বুঝি?

হ্যাঁ, তুমিই তো তখন বলছিলে, তাই।

মা হাসলেন। ফারুক বেরিয়ে এলো।

তোপখানা রোডে প্রেসক্লাব পেছনে রেখে তার রিকশা মোড় নিল, সেই ছোট্ট বেগুনি ফুলের বিরাট গাছটার পাশ দিয়ে। পাসপোর্ট অফিস পেরিয়ে সারকিট হাউসের কাছে এলো রিকশা। আর কিছুক্ষণ গেলে পরেই পৌঁছুবে সে তাহমিনাদের একতলার সামনে। এই মুহূর্তে হঠাৎ এক বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা কিংবা হয়ত শংকা তাকে ভর করল।

ছেড়ে দিল বিকশা। তারপর আবার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

.

সেদিন দুপুরেই অপ্রত্যাশিতভাবে তাহমিনার সাথে মুখোমুখি হয়ে গেল ফারুক ইউকালিপটাস এভেন্যুর ওপর। ফারুক হাঁটতে হাঁটতে উদ্দেশ্যহীন এসে পড়েছে এখানে। আর তাকে দূর থেকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে তাহমিনা! ভার্সিটি থেকে ফিরছিল। কোলের ওপর বই আর খাতা—-লাল মলাট দেয়া। পরনে সাদা সিফনের শাড়ি। পিঙ্কের ওপর বুটি ভোলা কনুই অবধি চোলি। পায়ে কর্ক টম স্যাণ্ডেল। মুখে তার ক্লান্তির ছায়া। অলস এলানো বেণি। চোখে সেই দীপ্তি দেখতে পেল না ফারুক।

কিছুক্ষণ তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। দ্রুত শ্বাসের তালে দুলে উঠল বুঝি তাহমিনার উন্নত বুক। সে পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত নিচু আর কম্পিত গলায় শুধালো, কবে এলে?

ফারুক কিছুই বলল না। যেন একটি মুহূর্তে অতিবাহিত হলো পৃথিবীর অনন্ত উত্থান ও পতনের সংকেত। শেষ অবধি বলল, কয়েকদিন।

আমাকে খবর দিলে না কেন?

সব কি সত্যি তাহমিনা?

তাহমিনা বুঝি মাথা দোলাতে চাইল কী বলতে গিয়ে। থামল। তারপর বলল, এস কোথাও বসিগে। বলছি।

চুপচাপ পাশাপাশি দুজনে হেঁটে উঠে এলো রমনা রাদেবুতে। একটা কেবিন বেছে নিয়ে বসল। ফারুক শুধালো, কি বলব?

যা খুশি। আমি কিছু খাবো না।

কেন?

আচ্ছা বলো। সামান্য কিছু।

ফারুক অর্ডার দিল পটেটো চিপস আর লেমন ড্রিঙ্ক।

চিপস এলো। কিন্তু একটাও ছুঁলো না কেউ। তাহমিনার আনত চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ফারুক। তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, আমার কথা একবার ভাবলে না মিনু? আমি কি করব, ভেবে দেখলে না? উত্তরের প্রতীক্ষায় সে চুপ করল। কিন্তু তাহমিনা কিছুই বলতে পারল না। ফারুক নিজের হাত টেনে নিয়ে গলা খাদে নামিয়ে বলল, তুমি আমার দিকে তাকাও তাহমিনা। জানি, তুমি তাকাতে পারবে না।

তাহমিনা এবার চোখ তুলল। তাকাল তার পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে। বলল, সব সত্যি ফারুক। কিন্তু আমি কী করব? আমাকে দুঃখ দিও না।

তুমি কিছুই করতে পারতে না?

কী করতে পারতাম?

তাহমিনা!

আমার কোন উপায় ছিল না

ছিল, তুমি সব করতে পারতে।

তাহমিনা চোখ নিচু করল। পেন খুলে খাতার ওপর হিজিবিজি কাটল খানিক। তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর উচ্চারণ করল, দোষ আমাকে দিতে চাও, দাও। আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমাকে তুমি বোকো না ফারুক। উপেক্ষা করতে চাও, কোরো। ভুলে যেতে চাও, যেও। কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা কোরো না।

বেশ, করবো না।

আমি কী করতে পারতাম বলো? বাবা ভারী দুঃখ পেতেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি কোন কথা বলতে পারি নি। বাবাকে আমি অসুখী করব কি করে? আমি কী করব? এ আমার হয়ত আত্মহত্যা, তুমি বুঝতে পারবে না ফারুক।

এইখানে আর বলতে পারল না সে। ঝুপ করে টেবিলে রাখা দুহাতের ভেতর মুখ নামিয়ে নিল। কান্নার মুদ্রায় কেঁপে উঠল তার পিঠ, কাঁধ। ফারুক বাঁ হাতের তেলোয় ন্যস্ত করল তার কপালের ভার। একটু পরে বলল, মিনু মুখ তোলো। সকলে কী ভাববে? ওঠ।

মুখ তুলল তাহমিনা। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুছে নিল এক ফোঁটা অশ্রু। সরিয়ে দিল কপালের ওপর পড়ে থাকা একগুচ্ছ চুল। চিবুকের ভাঁজ একবার কেঁপে উঠল। গালে তার ছোট্ট টোল উঠেই মিলিয়ে গেল।

সামান্য কিছু চিপস মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখল চিপসের রেকাবি। ফারুক টেনে নিল লেমনের গ্লাশ। দীর্ঘ ফিনফিনে কাঁচের গ্লাশে স্বচ্ছ সবুজ ড্রিঙ্ক। ছোট ছোট বুদবুদ উঠছে। ভেতরে কাঁচের গায়ে লেগে রয়েছে। দুএকটা এখুনি মিলিয়ে গেল। আর কী অদ্ভুত স্বচ্ছতা। মসলিন জমিনের মত। ফারুক হাত রাখল গ্লাশের পিঠে। আর সেই পানীয়ের শীতলতা মুহূর্তে প্রবাহিত হয়ে গেল তার স্নায়ুর গভীরে। সে অসম্ভব জোর দিয়ে গ্লাশটা আঁকড়ে ধরে বলল, অদ্ভুত শিশুকণ্ঠে, আমি তোমাকে বিয়ে করব তাহমিনা।

সে আর হয় না ফারুক।

কেন হয় না?

ওকথা শোনাও আমার পাপ এখন। তুমি বোল না।

তুমি বলতে পারলে মিনু! কিন্তু আমি যে কোনদিনই তা ভাবতে পারব না। আমি তোমাকে—-

তোমার পায়ে পড়ি ফারুক।

ফারুক গ্লাশ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল।

তাহমিনা ভাবল, আমাকে তুমি ভুলে যেও ফারুক। আমাকে তুমি, তোমার ঈশ্বরের মত জড়িয়ে ধরে রাখতে চেয়ো না। আমি জানি তুমি কষ্ট পাবে। কিন্তু আমি কী করব? আমি কী করতে পারতাম ফারুক? বিশ্বাস করবে যা তুমি, আমি কত অসহায়, কত রিক্ত! যদি আমাকে ঘৃণা করেও তোমার মুখ বালিশে মিগ্ন থাকতে পারে তবু ভালো, কিন্তু আমাকে বাসনা করে যেন বিন্দ্রি না থাকো। তাহমিনা মুখে শুধু বলল, তুমি রাগ করেছ ফারুক।

না রাগ করব কার ওপর? কিন্তু জানো তাহমিনা, সত্যি করে বলছি, তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি, তুমি যেখানেই থাকো যার কাছেই যাও, চিরকাল তোমার কথা আমি মনে করব। কোনদিন ভুলব না।

তুমি মনে কর তোমাকে আমি ভুলে যাবো?

কী জানি।

না আমি ভুলব না ফারুক।

তুমি ভুলে যাবে তাহমিনা। না মিনু, যে মনে রাখা পাপ, তা ভুলে যাওয়াই ভালো।

দুজনেই চুপ করে ভাবল খানিক। এক সময় তাহমিনা বলল, এখন কেমন আছো?

ঠিক তেমনি।

ফারুক নির্লিপ্ত সুরে অন্যমনে উত্তর করল তার।

কক্সবাজারে গিয়েও ভালো হলো না?

কিছুটা। কিন্তু ওকথা তুমি শুধিও না তাহমিনা।

কেন ফারুক?

তুমি কি তা বোঝো না?

বুঝি। এ অধিকারও তুমি আমার মুছে দেবে?

আমি তো কেউ নই মিনু।

তাহমিনা কোনো কথা বলল না এর জবাবে। শুধু মাথা নিচু করল একবার, উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে ঠিক করে নিল স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ। কেউ তাকে বুঝবে না। তারপর আবার সেই নিস্তব্ধতা। নিশ্চল দুজনে। যেন দুজনের কথাই ফুরিয়ে গেছে। চুপ করে থাকা ছাড়া যেন আর কোন ভাষা নেই। তাহমিনা আর ফারুক মুখোমুখি তেমনি গভীর নীরবতায় ডুবে রইল। বহুক্ষণ সেই কেবিনে। ফারুক মাথা তুলে বলল, আমি কোনদিন ভাবিনি এমন হবে। প্রথম এসে যখন শুনেছি তখন যে আমার কী হয়েছিল তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না তাহমিনা। আজ গিয়েছিলাম দেখা করতে তোমাদের ওখানে। কিন্তু মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছি। কেন জানো? তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইনি, তুমি যে আমার আপন। দৈবে দেখা না হলে হয়ত আর কোনদিন আমাদের দেখা হতো না। ফারুকের স্বর শোনাল ফিসফিস, যেন স্বগত উচ্চারণ করছে সে। এখানে সে একটু থামল। তারপর বলল, তুমি আমাকে কিছুই লিখলে না কেন তাহমিনা?

তাহমিনার গলা ভারী হয়ে এলো। উত্তরে বলল, তুমি মনে কর এ বিয়েতে আমি খুশি হয়েছি? ফারুক চুপ করে রইল।

তোমার যা খুশি মনে করতে পার ফারুক, দুঃখ রইল, বুঝলে মা। আমি কী করে তোমায় লিখতাম? কী করতে পারতাম? আর সে কিছুই উচ্চারণ করতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল।

পর্দা সরিয়ে এলো বেয়ারা নিয়ে গেল রেকাবি আর গ্লাশ। তাহমিনা বারেক চোখ বুজলো। ফারুক এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরালো। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে অ্যাসট্রেতে ডুবিয়ে দিল কাঠিটা। বলল, যাবার সময় হয়ে এল তাহমিনা। তুমি ভুল বুঝবে না। দোষ আমি কাউকে দেব না। তুমি কি করতে পারতে? সে আমি জানি। চল উঠি।

হ্যাঁ।

এই হয়ত আমাদের শেষ দেখা।

তাহমিনা চোখ নিচু করে বই ভ্যানিটি ব্যাগ গুছোলো। তারপর বলল, একটা কথা তোমায় বলব?

বলবে।

আমার কথা তুমি মনে রেখ। কোনদিন যে চিনতে সে কথা মনে রেখ।

সেও আমার পাপ। এ অন্যায় মিনু।

আর, যদি কোনদিন আমাদের দেখা হয়, তাহলে বলো মুখ ফিরিয়ে নেবে না।

আমি কিছুই বলতে পারছি না তাহমিনা। আমি কিছুই বলতে পারছি না।

একটু পরে ও বলল, মা তোমাকে ডেকেছিলেন। একবার যেও। শুনেছেন তুমি শীগগীরই ফিরবে।

কেন?

জানি না।

এরপর আর কোনো কথা হয় নি তাদের। দুজনে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন হঠাৎ পরস্পর থমকে দুজনের মুখের দিকে অপলক তাকিয়েছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আর সেই এক পলেই যেন কেটে গেল এক বিশাল সময়। তাড়াতাড়ি পা বাড়ালো তাহমিনা। পেছনে এলো ফারুক। আর তারা কথা বলল না। আর কেউ কারো দিকে তাকাতে পারল না।

.

কয়েকদিন পরেই সে গিয়েছিল তাহমিনাদের বাসায়। তাহমিনা ছিল বাসাতেই। কিন্তু সমুখে আসেনি। মালেকাবাণুও প্রথমে কিছুই বলেন নি ওর বিয়ের কথা। ঠিক আগের মতই আদর করে চা করে এনে দিলেন ফারুকের জন্য। বসে বসে এটা সেটা জিজ্ঞেস করছিলেন। আর তার অসুখের কথা।

ফারুক জানতো একসময় সেই কথা উঠবে, আর তখন সে কি পারবে নিজেকে ধরে রাখতে? বিয়েতে এসো ফারুক। আসবে তো?

এত মিষ্টি করে তিনি বলেছিলেন যে তা আজো সে ভুলতে পারবে না। আর তার স্বর এত স্নেহগভীর যে সে বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু উত্তরে মিছে করে বলেছে, ঢাকায় সে তখন থাকবে না। সিলেটের এক চা বাগানে কাজ পেয়েছে, এ মাসেই জয়েন করবে। মালেকাবাণু আর কিছু বলেন নি ওকে। তার কাছ থেকেই ফারুক শুনলো, তাহমিনা অনার্স ছেড়ে দিয়ে পাস দিচ্ছে। আর শুনলো আবিদের কথা।

সুন্দরবনের টিম্বার মার্চেন্ট আবিদ চৌধুরী, তার দাদার সময় থেকে এই কারবার ছিল বার্মায়। বাবা তার সম্প্রসারণ করেছিলেন সুন্দরবন অবধি। বিয়াল্লিশের বোমার পর বার্মা ছেড়ে তিনি চলে আসেন। আবিদ রেঙ্গুনে বি এম.কম পড়ত। সমস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বোমায়। শুধু তারা দুজন পালিয়ে এসেছিল বাঙলা মুলুকে। সেই শোকের ভার সইতে পারেন নি বৃদ্ধ আবিদেব বাবা। দেড় বছর পাই একমাত্র ছেলে আবিদের হাতে কয়েকলাখ টাকা আর বিরাট ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মারা নি তিনি। তারপর সাত বছর কেটে গেছে। দিনরাত অমানুষিক খেটে সেই ব্যবসা দিনে দিনে বাড়িয়েছে আবিদ। একদিনের জন্য বিশ্রাম নেয় নি। দেশের এ মাথা ও মাথা চষে বেড়িয়েছে সে কারবারের জন্যে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুবদের তদারক করেছে। বন্দরে গেছে। কোম্পানির প্রায় প্রৌঢ় ম্যানেজার আশরাফ মাঝে মাঝেই অনুরোধ করেছে, এমনি করে আর কতদিন, এবারে তার সংসারি হওয়া দরকার। সে কথায় সে কান দেয় নি। হেসে উড়িয়েছে।

তারপর বছর দুএক বাদে আশরাফ গোঁ ধরে বসেছে, এবার তাকে বিয়ে করতেই হবে। সে নিজে সব ঠিক করবে, তার কিছু ভাবতে হবে না।

এবারে আবিদ না করতে পারেনি। আশরাফ ব্যবসা সূত্রে ঢাকায় আসা যাওয়া করত। সেই থেকে জাকির সাথে আলাপ তার ফার্মে। তারপর আশরাফ আর আবিদ এসেছিল তাহমিনাকে দেখতে। সেই দিনেই বিয়ের কথা ঠিক হয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি যে হয়ে যাবে। তা কেউ ভাবতে পারে নি।

মালকাবানু উঠে গিয়ে আবিদের ছবি এনে দেখালেন।

তারপর তিনি আবার বললেন, ফারুক বিয়ের সময়ে ঢাকায় থাকলে খুশি হতেন। কিন্তু ফারুক উত্তর সেই একই দিয়েছে।

উঠে আসবার সময় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে এসেছে ফারুক। দোয়া করুন তিনি, চাকরিতে যেন তার ভালো হয়। মালেকাবাণু প্রাণ খুলে প্রার্থনা করলেন আল্লার দরগাহে। গেটের কাছে এসে ফারুক অনুভব করতে পারল অন্ধকার বারান্দায় তাহমিনা এসে দাঁড়িয়েছে। সে আর তাকাল না।

৭. হপ্তা দেড়েক আগে সেদিন

হপ্তা দেড়েক আগে সেদিন বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল আবিদ। তাহমিনা সেদিনও বাধা দিয়েছিল, না আজ যেও না। কিন্তু নিষেধ সে শোনেনি। বেরিয়ে গিয়েছিল। আর বিকেলেই সবাই ধরাধরি করে নামিয়ে এনেছে অচৈতন্য আবিদকে। হরিয়াল টিপ করেছিল ও। আর সেই হরিয়াল ডানা লুটিয়ে ঝুপ করে পড়ে গিয়েছিল নদীতে। এত বড় সুন্দর হরিয়াল নাকি সচরাচর মেলে না।

উত্তেজনায় ওটা ধরবার জন্য নিজেই যখন সে নদীতে নেমেছে তখন একটা কুমির জলের অতল থেকে ভেসে এসে ওর পা কামড়ে ধরেছিল। আর সে কী যমে মানুষে টানাটানি। চোখের পলকে যে কী হয়ে গেল তা কেউ ঠাহর করে উঠতে পারে নি। মেমসায়েবের কপাল ভালো, সায়েবের হায়াত দারাজ; অবশেষে আদালী আর মাঝিরা মিলে অসাধ্য সাধন করেছে। ডান পা দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে তখন। খুবলে নিয়েছে মাংস। আর আবিদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

একটা বার্নিশ করা প্রশস্ত খাড়াপিঠ চেয়ার টেনে দিয়েছে আবিদের বেয়ারা আবদুল। খুলে দিয়েছে বাংলার জানালার শার্সী। সেখানে রাত্রি চোখে আসে। ফারুক পিঠ সোজা করে খানিকটা উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে কথাগুলো শোনে। আর একটা হারিকেন জ্বালতে জ্বালতে আবদুল বলে চলেছে, অজ্ঞান হয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। বাংলোতে নিয়ে এসে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হলো পা। সন্ধ্যেয় একবার জ্ঞান ফিরেছিল। কিন্তু রাত্রে এলো বেহুশ জ্বর। এমন সে জ্বর যে ধান দিলে খৈ হয়ে যায়। আর ভুল বকতে লাগলেন

শুধু। —-এইখানে একটু থেমে দেশলাই নেভাতে নেভাতে সে বলল, শুধু মেম সায়েবকে বকতে লাগলেন। প্রলাপে, খুন করে ফেলেন আর কী।

ফারুক শুধালো তারপর?

তারপর, সকালে মেনসায়েবকে নিয়ে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। এখন আল্লা মালেক।

ফারুক একটু আড় হয়ে বসলো চেয়ারে। তাকিয়ে রইল বাতাস দোলানো হারিকেন শিখার দিকে।

হাসপাতালে আবিদকে রেখে সেদিনই সন্ধ্যেয় তাহমিনা ফিরে এসেছে বাংলোয়। কাল আবার খবর পেয়ে গেছে সদরে। এখনো ফেরেনি। আবদুলের হারিকেন জ্বালানো শেষ হলো। সলতে একটু উঁচিয়ে নিয়ে ও বেরিয়ে গেল একটু সামনের দিকে ঝুঁকে।

ফারুক তেমনি বসে রইল অনেকক্ষণ। বাইরের প্রান্তর কেমন অদ্ভুত আবছা লাগছে। কেন সে এসেছে এখানে? অরণ্যের বাংলোতে? প্রেতের ডানার রং যেন চারদিকে। ফারুকের সমস্ত কিছু মিলিয়ে গেল, মিশে গেল। যুক্তি বুদ্ধি বিশ্বাস সবকিছু। শুধু কি এরই জন্য তাহমিনা তাকে ডেকে এনেছে এতদিন পরে ঢাকা থেকে? কেন সে ডাকল না তার ভাইকে, যদি আবিদের বিপদটাই মুখ্য হয়?—-ফারুক তাকে কী দিতে পারে?—-কী করতে পারে সে? —-সে ভাবল।

www.bengaliebook.com

গোটা পৃথিবীতে যেন কেউ নেই। তাহমিনা নেই, আবিদ নেই। কেউ না। একেলা এই বাংলোয় সে একা। একেল এক অরণ্যের রাত্রি নিঃসঙ্গতায় পূর্ণ। এ বাংলোয় বুঝি আর কেউ থাকে না। আর কারো সাড়া নেই। এ অরণ্যে বুঝি মানুষ থাকে না। ফারুকের মন ভয়ে ভরে উঠল। ঠিক ভয় নয়, সূক্ষ্ম একটা উদ্বেগ মাত্র। আর সেটাই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল এখন। এইমাত্র যে আবদুল ছিল তার সমুখে দাঁড়িয়ে তাও কেমন অবিশ্বাস্য মনে হলো। ফারুক মুখ ফিরিয়ে নিল জানালা থেকে। এমন সময় আবদুল ফিরে এল, হুজুর।

কে, আবদুল? ও।

আসুন হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলাবেন না? বাথরুমে পানি দিয়ে এসেছি।

ফারুক চুপ করে রইল। আবদুল বলল, মেমসায়েব কাল ভোরেই এসে যাবেন। আপনি কিছু ভাববেন না। এখন আসুন।

আবদুল, আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি।

হুজুর! বিস্মিত হলো আবদুল তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে।

হ্যাঁ এখুনি। একটা নৌকো ডেকে দাও ঘাটে লঞ্চ পাবোই। আর তোমার মেমসায়েব এলে আমার সালাম দিও।

হুজুর অসুবিধেটা কি, ঠিক

না, না, তার জন্যে নয়।

সায়েবের একটা কিছু খবর না নিয়ে—-

আবদুল তবু ধরে রাখতে চাইল। কিন্তু ফারুক বাধা দিল। উঠে দাঁড়াল। বলল, বোধ হয় বাংলো ফেলে তুমি যেতে পারবে না। কাছে ভিতে কোনো লোক থাকলে সাথে দাও। তার দরকার হবে না। আমি নিজেই আসছি। কিন্তু এই রাত বিরেতে না বেরিয়ে থেকে গেলেও পারতেন হুজুর!

একটা সিগারেট ধরিয়ে ফারুক উত্তর করল, সে হয় না আবদুল।

আবদুল নীরবে সুটকেশগুলো হাতে তুলে নিল। দরোজায় লাগিয়ে দিল তালা। তারপর মুখে বলল, বেশ চলুন।

কিন্তু ডান দিকের করিডর ঘুরে সামনের বারান্দার ভাঁজে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল ফারুক। যেন ভীষণ একটা কিছু সে দেখেছে। এক পাও নড়তে পারল না। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুর্বোধ্য দুএকটা শব্দ গড়িয়ে পড়ল শুধু।

নিচে, তাহমিনা উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। পেছনে কে একজন। সম্ভবত মাঝি কিংবা খানসামা কেউ হবে। তাহমিনা পেছন পানে তাকিয়ে উঠতে উঠতে বলছে, বাতিটা একটু ভালো করে ধর গফুর। পা হড়কে যেতে পারে। কে আবদুল?

ফারুক প্রার্থনা করল অন্ধকারের সাথে মিশে যাবার জন্যে। কিন্তু কিছুই সে করল না। শুধু একটুখন পরে উচ্চারণ করল অত্যন্ত নিচু গলায়, আমি তাহমিনা।

নিস্তব্ধতা।

ও। তুমি।

তাহমিনা মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। হারিকেনের মৃদু মালোয় তাকাল পরিপূর্ণ গভীর চোখে। তারপর তার দৃষ্টি হয়ে এল শূন্য। ফারুক সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল না। কেউই নিল না। তিন বছরে আরো সুন্দর হয়েছে তাহমিনা। নেবেছে আশ্চর্য ডার্ক আইভরির মসৃণতা। আর তাহমিনার সেই চঞ্চলা দেহে এখন মন্থরতা। চিবুকের সেই কোমল ভাঁজ এখনো রয়েছে। তেমনি ঈষৎ উত্তোলিত তার—-ভঙ্গ। কুয়াশা লাল ঠোঁট। উন্নত গ্রীবা। আরো একটু বয়স হয়েছে তাহমিনার স্নিগ্ধ লাবণ্যের ছায়া পড়েছে মুখের আদলে। আর

অলসতর তার শ্রোণীর। ফারুক দেখল। ফারুক সম্মোহিত হলো। কিন্তু তাহমিনা দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য। তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, ফিরে যাচ্ছিলে? কতক্ষণ এসেছ?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আবদুল নীরবে ফিরে গিয়ে তালা খুলল। তাহমিনা এক পা ভেতরে গিয়ে তারপর ঈষৎ আনত পেছন ফিরে শুধালো, ভেতরে আসবে না?

.

ফারুক আবার গিয়ে ঠিক সেইখানে সেই চেয়ারে বসলো। এবারে দেখা দিল নতুন একটা সমস্যা। এতক্ষণ তবু তাহমিনা ছিল না, এখন সে এসেছে–ফারুক তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারল তীব্র করে। সে স্থির হয়ে, হয়ত কিছুটা বিসদৃশভাবে, বসে রইল। দূরে দাঁড়িয়ে আবদুল। আর তারো কিছুটা পেছনে তাহমিনা প্রায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। ফারুক তার পায়ের তলায় অনুভব করল কার্পেটের কোমলতা। আর শুনল তাহমিনা বলছে, পেট্রোম্যাক্স জ্বালো নি আবদুল?

না মেম সায়েব। আপনি নেই তাই আর ওটা জ্বালি নি। জ্বালব কী?

না থাক, এখন আর দরকার নেই। এইখানে সে তাকাল ফারুকের দিকে। ফারুক একটু পরে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন উনি?

তাহমিনা প্রশ্নের দৃষ্টিতে একবার ফারুক তারপর আবদুলের দিকে তাকাল। সংশোধনের হাসি হেসে বলল ফারুক, হ্যাঁ, ওর কাছ থেকেই শুনেছি।

তাহমিনা উত্তর করল, কিছুটা কম্পিত স্বরে, প্রায় আগের মতই। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ডাক্তার কী বললেন?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর পেল না ফারুক। তা না পাক। উত্তর তাহমিনার মুখেই লেখা ছিল। তাই আর সে কোনো প্রশ্ন করল না। তাহমিনা কোনো কথা না বলে রূপসার মত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। অপসারিত হলো মেঝে থেকে তার দেহছায়া। আবদুলও চলে গেল প্রায় সাথে সাথে।

আবদুল ফিরে এসে বলল, মেম সায়েব শুধোচ্ছিলেন—- খাবার কথা।

খাবার ইচ্ছে নেই আবদুল। তুমি বরং ওকে ডাকো।

কিন্তু জিজ্ঞেস করলেন কি খাবেন জেনে আসতে।

সন্ধ্যের আগেই খেয়ে নিয়েছি। এত রাতে মিছেমিছি কষ্ট কোরো না।

সেকি কথা হুজুর!

অবশেষে ফারুক বলে দিল শুধু চায়ের কথা। আবদুল বলল, তার আগে চলুন হাত মুখ ধুয়ে নেবেন।

ফারুক উঠতে যাচ্ছিল। এতটা পথ স্টিমার আর লঞ্চে এসে অনেকটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। ঘুমে ভারী হয়ে আসছিল চোখ। আঠার মত সারা গায়ে যেন ট্রাউজার আর শার্ট সেঁটে আছে। সেগুলো না ছেড়ে রাখা অবধি কিছুতেই স্বস্তি আসবে না। এমন সময় সিঁড়িতে বাইরে কার পায়ের আওয়াজ আর গলা শোনা গেল, আবদুল, আবদুল।

আবদুল প্রায় ফিসফিস স্বরে ফারুককে বলল, আশরাফ সায়েব আসছেন—- হুজুরের ম্যানেজার সায়েব।

ও।

বলেই সে বাইরে এগিয়ে গেল।

এমন একটা বিশ্রী অবস্থায় ফারুক যে এত শীগগীর এমনভাবে পড়ে যাবে তা সে এর আগে ভাবতেও পারে নি। সে আশা করে নি এত তাড়াতাড়ি বাইরের কারো সামনে তাকে আসতে হবে। কি দেবে তার পরিচয়? আর কেনই বা সে এখানে এসেছে, তার জবাবেই বা কি বলবে? কিছু না জেনেও তার স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে তাহমিনার চিঠির কথা কাউকে সে বলতে পারবে না। এই সময়ে চকিতে তার চোখের সামনে

আরেকবার ভেসে উঠল চিঠিটা—-দ্রুত হস্তাক্ষরে বাঁকা দুর্বল লাইনে লেখা তাহমিনার চিঠি। আর সে যেন স্পষ্ট শুনতে পেল তাহমিনার স্বর—- “যদি কোনোদিন আমাকে তুমি তোমার একান্ত বলে ভেবে থাকো, তাহলে এ চিঠিকে তুমি উপেক্ষা করবে না, এ আমি জানি।” ফারুক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ারে নিঃশব্দে আবার বসে পড়। ভ্রমণের ক্লান্তি যেন তাকে এখন ছুঁয়ে গেল গভীরতর। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাইরে থেকে আশরাফের গলা শোনা গেল, কিরে আবদুল, তোর মেমসায়েব ফিরলেন নাকি এখন?

হ্যাঁ।

আবিদের খবর কী?

একই রকম তো বল্লেন। আর কিছু শুনিনি এখনো।

কাল তো ফেরার কথা ওর। আজকেই ফিরল যে?

কী জানি।

আশরাফ একটু কাশলো। তারপর আবার বলল, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দ, তারপর অনেকক্ষণ পরে আবার ঘাট থেকে আলো দেখে ভাবলাম দেখে আসি একবার। ঘুমোস কত যে অমন করে দরজা ধাক্কাতে হয়? চল, চল, ভেতরে চল শুনি।

আবদুল গলা একটু নামিয়ে বলল, ফারুক তবুও শুনতে পেল, নতুন এক সায়েব এসেছেন, তিনিই কড়া নেড়েছিলেন।

কে সায়েব রে?

ফারুক স্থির হয়ে বসল। আবদুল উত্তর করল, ঢাকা থেকে এসেছেন। আর মেমসায়েব তো এলেন এইমাত্র।

আশরাফ একটুখন চুপ করে রইল। তারপর শুধালো, তোর মেমসায়েব কোথায়?

উনি তো ভেতরে।

হুঁ।

এরপরেই আশরাফ এসে দাঁড়াল দরোজায়। ফারুক চোখ তুলে তাকালো। আশরাফের আসল বয়স বিয়াল্লিশের বেশি হবে না। কিন্তু চট করে দেখলে ঠাহর করা যায় না। আরো বেশি মনে হয়। কপালে দুটো ভাঁজ পড়েছে। তীক্ষ্ণ নাক। আর স্কুট চোয়ালের

হাড়ে দৃঢ়তার। ছাপ। প্রশস্ত কাঁধ। লম্বায় প্রায় ছফুট কি তারো বেশি হবে। দীর্ঘকাল অরণ্যে কাটিয়ে মজুর খাঁটিয়ে চেহারাটা তার কঠিন হয়ে এসেছে অস্বাভাবিক রকমে। এখন পরনে তার ভাঁজ দুমড়ানো পাঞ্জাবি পাজামা। বাঁ হাতে দুব্যাটারির ছোট্ট তীব্র টর্চ। ডান হাতে রাইফেল। ফারুক একটু অস্বস্তি বোধ করল, বিব্রত হলো। তারপর উঠে দাঁড়াল। আশরাফ হেসে বলল, আরে বসুন, উঠছেন কেন? এ অরণ্যে তার বালাই আমরা রাখিনি। সব ক–বে ভুলে মেরে দিয়েছি।

বলেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল আশরাফ। ফারুক প্রথমে বিস্মিত হলো, তারপর নিচু গলায় সেও হাসিতে যোগ দিল। তার সম্বন্ধে যে ধারণা সে প্রথমে করেছিল এক মুহূর্তে তা কেটে গেল।

ঢাকা থেকে আসছেন বুঝি?

হা। ফারুক শুকনো গলায় বলল।

আবিদের ব্যাপারটা শুনেছেন তো? বড় বিপদে পড়ে গেছি সবাই। এ সময়ে আপনি এলেন। ভালো কথা, আপনার পরিচয়টা আমার জানা হোলো না।

ফারুক কিছু একটা বলবার আগেই দরোজার কাছ থেকে এই মাত্র সে এসে দাঁড়িয়েছে— তাহমিনার উত্তর এলো, ও আমার মার সম্পর্কে ভাই হয় আশরাফ সায়েব।

দুজনেই প্রায় একসাথে তার দিকে ফিরে তাকাল, আপনি দেখেন নি ওকে। অনেকদিন। থেকেই আসতে চেয়েছিল এখানে বেড়াতে। তারপর তাহমিনা ফারুকের দিকে তাকিয়ে বলল, আর ইনি আমাদের ফার্মের সব, আশরাফ আহমদ।

তাহমিনা শান্ত স্বরে প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ভেতরে এসে বসল। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে এসেছে ও। অনেকটা স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে ওকে। ফারুক একবার তার দিকে তাকাল। ঘরে কিছুকাল তীব্র নিস্তব্ধতা। অবশেষে আশরাফ প্রথমে বলল, ও তারপর বলল, ঘাটে আলো দেখে ভাবলুম তুমি এসেছ। তাই উঠে এসেছি। খবর কী?

ভালো। —-ভালোই।

ডাক্তার কী বললেন?

উনি তো আশা রাখছেন এখনো।

পা কি বাঁচানো যাবে?

তাই তো বলছেন।

যাক তবু ভালো। আমার একবার যাওয়া দরকার আবার দেখতে। কিছু বলেছে নাকি আমার কথা?

তাহমিনা একটু অন্যমনা হয়ে পড়েছিল। চকিতে চমক ভেঙে বলল, না, বলে নি।

নতুন কয়েকটা বড় অর্ডার এসেছিল, তাই বলছিলাম। দেখি কি করা যায়।

তাহমিনা কোনো কথা বলল না। আশরাফ হঠাৎ ফারুকের দিকে তাকিয়ে বলল, এ সব কাজ বুঝলেন ঝামেলার একশেষ। একা কুলিয়ে ওঠা যায় না। এসেছেন, সবি দেখবেন আস্তে আস্তে।

ফারুকের একটা কিছু বলা দরকার, সে অনুভব করল, তাই বলল, সে তো নিশ্চয়ই।

দেখছেন তো কাঠের কারবার, কিন্তু ধারণা করতে পারবেন না কী কাঠখড় এর পেছনে পোড়াতে হয়।

ফারুক একটু হাসল শুধু। তাহমিনা তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কাপড় বদলালে না? আবদুল চা নিয়ে আসছে এখুনি।

হু, বদলাচ্ছি।

আশরাফ বলল, তাই তো, আপনার এসব এখনো হয় নি। আমার খেয়ালই ছিল না। রাত তো অনেক হয়েছে। আচ্ছা তাহমিনা, আমি তাহলে যাই। আসি আমি, কাল সকালে আপনার সাথে আলাপ করব।

আশরাফ উঠছিল। ফারুক বাধা দিল, বসুন চা খেয়ে যাবেন।

খেপেছেন! এই রাতে চা খেলে ঘুম হবে মনে করেছেন? তার ওপর বাসায় ও আবার জেগে রয়েছে।

এমন কিছু দেরি হবে না আপনার একটু বসলে। তাছাড়া চা খেলে রাতে ঘুম হয় না কে বলল?

তাহমিনা বলল, বসুন না। এক কাপ চা–ই তো। আবদুল, আবদুল।

আচ্ছা।

আশরাফ চেয়ারে একটু আড় হয়ে বসলে।। আবদুল এলে পর তাহমিনা বলল, যাও ওকে বাথরুম দেখিয়ে দাও। যাও তুমি।

.

আবদুলের সাথে করিডর ঘুরে পেছনের বারান্দার শেষ প্রান্তে বাথরুমে ঢুকলো ফারুক। আবদুল হারিকেনটা এগিয়ে দিল। টাবে পানি তোলা রয়েছে কানায় কানায়। র‍্যাকে পরিষ্কার টাওয়েল রাখা। দেয়ালে লম্বা আয়না। আর তার নিচেই কেসে রাখা নতুন সাবানের শুভ্র কেক। সমস্ত মেঝে সদ্য ভিজে। আর কেমন একটা চেনা মিষ্টি সুবাস বাতাসে। শিরশির করা! ফারুক কেকটা তুলে নিল।

সমস্ত কিছুই তার কাছে কেমন রহস্যময় আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। কদিন আগেও সে কি ভাবতে পেরেছিল তাকে এখানে আসতে হবে? তাহমিনার সাথে দেখা হবে? আর ওর ব্যবহারটা অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে। চিঠি পেয়ে, এমন কী এখানে এসে অবধি আকাশ পাতাল অনেক কিছু মনে হয়েছিল তার। কিন্তু তাহমিনা অস্বাভাবিক রকমে শান্ত স্নিগ্ধ আর উজ্জ্বল। কত সহজে সে তার পরিচয় নিজে দিল আশরাফের কাছে। ও কেন লুকালো তার আসল পরিচয়? কী হয়েছে তাহমিনার? আবিদের দুর্ঘটনা যে এর কারণ নয় তা সে বুঝতে। পারল। তাহলে কী? চোখের সমুখে একবার তাহমিনার চেহারাটা মনে করতে চেষ্টা করল সে।

ফিরে এল যখন, তখন নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হোল তার। আবদুল এর মধ্যেই সব কিছু সাজিয়ে ফেলেছে। রেকাবিতে রাখা পুডিং আর রূপোর চামচ। ট্রের ওপর ঢাকনা দেয়া কেটলি। চা ঢেলে দিল তাহমিনা। তিনজনে হাতের ওপর টেনে নিল সোনালি বর্ডার দেয়া নীল ফুল তোলা সোনালি পানিয়ের কাপ।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আশরাফ গল্প করতে লাগল—-বার্মার গল্প, ইরাবতী তীরের কথা। কথাটা উঠল আবিদের দুর্ঘটনা থেকে। তখন আশরাফ আবিদের বাবার সাথে ইরাবতীর তীরে নতুন জঙ্গলের ইজারা নিয়ে ঘুরছে। কাটা হচ্ছে গাছ। হাতি দিয়ে গড়িয়ে নদীর কিনারে নিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা বেঁধে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কুলিরা। আশরাফ দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। সেই সময় মাঝ নদীতে এক কুলি পড়ে যায় হঠাৎ। একই দুর্ঘটনা ঘটেছিল তারো। তবে কুমির নয়, কুমিরের সগোত্রই এক জলজ জন্তু কামড়ে ধরেছিল তার পা। আর সেকি তার বুক ফাটা আর্তনাদ! শেষ অবধি যখন তাকে তীরে তুলে নিয়ে আসা হলো তখন স্রোতের মত ধারায় রক্ত পড়ছে। আশরাফ এরপর একটু থেমে বলল, অবাক হয়েছি সবচে, বুনো লতাপাতা খেয়ে-বেঁধে লোকটা সেরে উঠেছিল। অনেকদিন আগের কথা, এখনো স্পষ্ট আমার মনে আছে। কাজেই ভয়ের কিছু নেই তাহমিনা। আচ্ছা, এবার তাহলে, আমি চলি। আশরাফ ফারুকের দিকে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল। তুলে নিল টর্চ আর রাইফেল। একবার রাইফেলটা ঝাঁকাল, তারপর চলে গেল। ফারুক তার পেছনে পেছনে তাকিয়ে রইল। আবদুল আস্তে আস্তে সব নিয়ে গেল। এখন শুধু নিস্তব্ধতা। কেউ কোন কথা বলল না। কেউ কারো দিকে তাকাল না। হঠাৎ যেন স্তব্ধ স্পন্দনহীন হয়ে গেছে সবকিছু এক নিমেষে।

তাহমিনা।

বলো। স্বর তার কেঁপে গেল।

আমি কিছুই বঝুতে পারছি নে।

তাহমিনা আয়ত গভীর চোখ মেলে তাকাল তার দিকে। ফারুক হঠাৎ তার কথার খেই হারিয়ে ফেলল যেন। এবারে বলল, ফিসফিস করে, আশরাফের কাছে আমার মিথ্যে পরিচয় দিলে কেন? যদি ও জানতে পারে, যদি আবিদ জানে, তাহলে কী হবে? তোমার কী হবে?

তুমি চলে যেতে চাও? তাহলে এলে কেন?

ফারুক হঠাৎ চুপ করে গেল একথায়। মাথা নিচু করল।

আমি ক্লান্ত। তোমার ঘর ঠিক করে দিয়েছি। আবদুল বিছানা করে রেখেছে। আমি যাই। তাহমিনা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল। তার পায়ের নরোম শব্দ মিলিয়ে গেল একটু পরে। আবদুল এসে হারিকেনটা হাতে নিয়ে বলল, আসুন।

হ্যাঁ, চল।

পাশের কামরাতেই শোবার ব্যবস্থা হয়েছে তার। অনেকটা লম্বা আর কম প্রশস্ত কামরা। একধারে পাতা নিচু পালং। পুরু তোষকের ওপর নীল বর্ডার দেয়া ধবধবে চাদর পাতা। অনেক বড় দুটো বালিশ সাদা চিকন লেস আঁকা। ঠিক যেমন ভালোবাসে ফারুক। আর এ ধারে দেয়ালে ঝোলানো জলরংয়ের ল্যান্ডস্কেপ। বাঁ হাতে দৈর্ঘ্যের দিকে দুটো জানালা। ছবির ফ্রেমের মত দেখতে। শার্সির ওপরে একটু বাতাসে কাঁপছে সিলভার সবুজ পর্দা।

ফারুক অবসাদে এলিয়ে দিল তার সারা শরীর। আবদুলের পদশব্দ দূরে নেবে হারিয়ে গেল। আর কিছুই সে ভাবতে পারছে না, সমস্ত অনুভূতি যেন তার অবশ হয়ে গেছে। শুধু ঘুম পাচ্ছে। এক সময়ে আধো ঘুম আধো জাগার ভেতরে সে শুনতে পেল কিছুটা কাছেই, অথচ কাছেও নয়, একটা দরোজা বন্ধ হয়ে গেল। তার ঝাঁকুনিতে বুঝি একটু শিরশির করে উঠল কাঠের দেয়াল। হারিকেনের ছোট্ট সলতেয় কামরার ভেতরে দীর্ঘ চিকন কাঠের প্রাঙ্কের অসংখ্য সমান্তরাল রেখায় ছায়ার ভাঁজ পড়েছে। অন্ধকার লাগছে তাব ক্রীমরঙ পেন্ট। ফারুক ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

অনেক রাতে কী করে যেন ঘুম ভেঙে গেল তার। কী একটা ধ্বনিতে, কিসের একটা নরোম শব্দে সে জেগে উঠল। এমন কিছু নয়, খুব মিহি, তবু তার ঘুম ভাঙলো। প্রথমটায় তন্দ্রা, তারপর চোখ মেলে তাকাল ও। ওপরে সিলিংয়ে শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার।

চোখ সয়ে এলে পর কান পাতলো শোনবার জন্য। কে যেন হাঁটছে তার কোমল পা ফেলে, সাবধানে আর ধীরে। বুকের ভেতরে গিয়ে সেই পদশব্দ যেন ঢেউ তুললো। রক্তে তার নামলো আশ্চর্য অনুরণন। আর জাগলো বিচিত্র একটা অনুভূতি। থেমে গেল সেই শব্দটা। ফারুক উঠে বসলো। জানালার পাশে দুধ–সুপুরির একটা উন্নত ডালে বাতাস উঠলো শিরশিরিয়ে। সেও সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো।

রেলিং ধরে একেলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল তাহমিনা। সে এসে দাঁড়াল ঠিক তার পেছনে। রাত্রির অতল থেকে গড়ে উঠেছে যেন তাহমিনার শুভ্র দেহ! শিথিল শাড়ি সরে গেছে মাথার ওপর থেকে। একরাশ চুল কাজল মেঘের মত অথবা এই অরণ্যের মত

বিস্তৃত তার পিঠের ওপরে। আর তার মিহি সৌরভ বাতাসে। বাইরে বেলে জোছনা। এমনি কোনো চন্দ্ররাতে হরিণ আর হরিণীরা বুঝি টের পায় কিসের আভাস। নির্জন তাদের বাসা ছেড়ে ঘাসের ভিতর দিয়ে পরস্পর নদীর জল শেষে। ফারুক অনুভব করল এক আকর্ষণ। সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে। দাঁড়াল। তাহমিনা চকিতে মুখ ফিরিয়ে তারপর শ্বাস ফেলে উচ্চারণ করল, ও, তুমি।

ফারুক বলল, এখনো ঘুমোও নি তাহমিনা?

তাহমিনা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অন্ধকারে। কোনো কথা বলল না। একটু চুপ কবে থাকল ফারুক। তারপর এত নিচু গলায় বলল যে তার কথা প্রায় শোনা গেল না, আমি চলে গেলেই ভালো ছিল। শুধু শুধু আমাকে ধরে রাখলে। এমন হবে জানলে আমি আসতাম না।

কী জানলে?

আমি বলে বোঝাতে পারছি নে।

তুমি যেতে চাইলে আমি বাধা দেবার কে?

সে কথা নয় তাহমিনা, একটু থামল, ও নেই, তাই বলছিলুম।

তুমি পাগল। তুমি ঘরে যাও।

ফারুক দূরে ঘন ঝোঁপের দিকে তাকিয়ে রইল খানিক। তারপর সেদিকে চোখ রেখেই বলল, তোমার ভয় করে না? এক বাংলোর নিচে একেলা আর একজনের সাথে থাকতে তোমার ভয় হয় না?

তাহমিনা হাসল মৃদুস্বরে। একটু সরে গেল রেলিংয়ে।

তাহলে তোমাকে থাকতে বলতাম না।

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই ফারুক একটুখন পর বলল, তোমার চিঠি পেয়ে এক মুহূর্ত আমি দেরি করিনি। সমস্ত কাজ ফেলে এসেছি তোমার কাছে।

আমি জানতাম।

হঠাৎ আমাকে তুমি আবার লিখলে কেন তাহমিনা?

একটু যেন চমকে উঠল ও। মুহূর্তের জন্য বুঝি ম্লান হয়ে গেল তার মুখ। উন্নত বুক তার স্ফীত হয়ে উঠল। কয়েকটা দৃঢ় টোল পড়ল গালে। ছায়াভাঁজ। মিলিয়ে গেল। কী যেন সে বলতে চাইল। অথচ পারল না। চলে যেতে চাইল। ফারুক স্পর্শ করল তার বাহুতে।

তুলে নিল মুঠোয়। বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে গেল সেই স্পর্শ পরস্পরের ভিতরে। বলল, শোনো, তুমি চলে যাচ্ছ?

তাহমিনা দাঁড়াল, কিন্তু সরিয়ে দিল না তার স্পর্শ। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ এক দৃষ্টি মেলে তাকাল তার দিকে। ফারুক বোকার মত হাত সরিয়ে নিল, আমি দুঃখিত তাহমিনা, একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।

৮. সকালে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢেলে

সকালে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢেলে চিনির পট হাতে নিয়ে অত্যন্ত সহজ সুরে, যেন কিছুই হয়নি এমনি কণ্ঠে শুধালো তাহমিনা, কচামচ চিনি দেব?

একটা।

এখনো চিনি কম খাও? আশ্চর্য।

কিশোরী-কুমারীর মত সুন্দর হাসি মাখল ও সারা মুখে। রিনটিন চুড়ি বাজলো চিনি নাড়তে গিয়ে। বুকের শাড়ি একটু নত হল সমুখের দিকে।

ফারুক বিস্মিত হলো। গত রাতের সমস্ত কিছু, বিশেষ করে মাঝরাতের সেই ঘটনা, এখন তার কাছে বিরাট এক অবাস্তব স্বপ্ন বলে মনে হলো। দিনের আলো বড় উজ্জ্বল আর প্রখর। দিনের আলোয় কত সহজ হয়ে এসেছে পৃথিবী। আর তাহমিনারও যেন কিছু মনে নেই, সব ভুলে গেছে। হাসছে। যেন এই প্রথম দেখা হলো। যেন এই হঠাৎ তাদের মুখোমুখি।

খাবার ঘরে টেবিলের দুপ্রান্তে দুজন বসে। মাথার ওপরে সৌখিন রংবাতির ঝাড়। কালো কাঁচে ঢাকা সমস্তটা টেবল-টপ। তার মাঝামাঝি ছায়া উল্টো হয়ে এসে পড়েছে রংবাতির। উবু হলে মনে হয় নিমেষে পায়ের তলায় যেন সারা সিলিং চলে এসেছে।

তাহমিনা চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে দেখল তারো এক অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পড়েছে টেবিলের ওপর। ফারুকেরটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

তাহমিনা ভাবল, ফারুক কি ভাবছে এখন? একবার তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আঁচ করতে চাইল কিছু। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। ফারুক নিশ্চিন্ত মনে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। একবার ভ্র তার কুঁচকে এলো। কি হলো? না, কিছু না। তিন বছরে বলিষ্ঠতর হয়েছ তার দেহ। দিনের আলোয় সে দেখল, মুখে তার আত্মবিশ্বাস আর পৌরুষত্বের রেখা। তার নিজের চিঠির কথা মনে পড়ল। ভীষণ লজ্জা হলো। ছি, ছি, ফারুক হয়ত কী না কী ভেবেছে। এতটা উন্মাদ সে হয়ে গিয়েছিল কী করে। তারপর কি ভেবে তাহমিনা মন থেকে এখন মুছে ফেলতে চাইল এই ভাবনা। সে দৃঢ়া হলো। ফারুক বলল, কি ভাবছ?

কই, কিছু নাতো। এমনি। ঢাকার খবর কী?

ভালো।

অনেকদিন যাইনি, একবার যেতে ইচ্ছে করছে।

গেলেই তো পার।

কই আর পারি!

তাহমিনা হাসল। তারপর বলল শেষ যেবার ঢাকা গিয়েছিল সেই গল্প। ফারুক ধরালো সিগারেট। তাহমিনা শুধালো, আমাদের ওখানে যাও?

না।

ও।

অন্যমনা সুরে অনুমোদন করল তাহমিনা।

তুমি আজকাল কি করছ? তোমার মা?

ভালোই আছেন। তবুও বুড়ো মানুষ তো?

সেতো ঠিকই। আর তুমি?

জার্নালিজম করছি।

তাই নাকি? তোমার তো ওদিকে ন্যাক ছিলো। কোন কাগজে আছো?

ইংরেজি কাগজে। সম্পাদকীয় লিখি। ফরুক দৈনিকের নামটা বলল। তারপর একটু পরে, ছুটি নিয়ে এসেছি। এর আগে ছুটি নেবার বড় একটা দরকার হয় নি। বলেই বিসদৃশভাবে কথাটা গুটিয়ে নিল। এবথা তো তাহমিনা শুনতে চায় নি। তাহমিনার দিকে চোর চোখে সে তাকাল। তারপর মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, ও গুলোই বুঝি সুন্দরী গাছ, না?

বাইরে, দূরে যেখানে কাল বাতে অন্ধকার দেয়ালের মত মনে হয়েছিল, এখন সেখানে লম্বা মাথা উঁচু গাছের সার চোখে পড়ল। তবু এমন কিছু ঘন নয়। প্রায়ই কেটে ফেলা হয়েছে। অনেকদি আগে–কাটা গুঁড়ির মুখ চকলেটের মত তামাটে হয়ে গেছে। আর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। তাহমিনা সেদিকে তাকিয়ে তার উত্তর করল, হ্যাঁ। বোধহয়।

আর রাস্তাটা?

অনেকদূর চলে গেছে ভেতরে। আমি একবারই মাত্র গিছলুম—-দুমাইল হবে। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পেতে ওই পথের ওপরে কাছেই আশরাফ সায়েবদের বাড়ি।

ও। বেশ লোক কিন্তু।

হুঁ।

তোমাদের আবদুলটি কিন্তু বিনয়ের অবতার।

তাহমিনা একটু হাসল, হুঁ তাই। চব্বিশ পরগনায় দেশ ছিল। রিফুজি হয়ে এসেছে। অত্যন্ত নিচু কাটা কাটা সুরেলা সুরে কথা বলছে ও। নিজের কানেই বড় ভালো লাগছে সেই সুর। সে এবার শুধালো ঘাড় একটু বাঁকিয়ে কানের লতিতে মৃদু চাপ দিয়ে, কেমন লাগছে তোমার জায়গাটা?

ভালো, খুব ভালো।

কিন্তু তারপরেই ফারুকের মনে হোলো বড় কম বলা হোলো। তাই আবার বলল অদ্ভুত এক ধরনের ভাঙা আর গম্ভীর গলায়, নতুন পৃথিবীতে এসেছি যেন! এত সবুজ, আর এতো আলো আমি আর কোনদিন দেখিনি। আমার কেমন ভালো লাগছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, ফারুকের এই কথা উচ্চারণ করবার পর, দ্রুত শূন্য দৃষ্টিতে তাহমিনা উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। চকিতে বিরাট ছায়া পড়ল টেবিলের ওপর তার নাভিমূল অবধি। ডাকল আবদুল,আবদুল।

জি মেমসাব।

আবদুল অদৃশ্য সাবানে হাত ধুতে ধুতে এসে দাঁড়াল।

টেবিল সাফ করো। চলো, তুমি না বাংলো দেখতে চেয়েছিলে ভোরে। এসো আমার সাথে। ফারুক উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনের প্রশস্ত বারান্দা হেঁটে ডান দিকের করিডর পেরিয়ে পেছনের বারান্দায় এলো। পাশাপাশি, কিছুটা সমুখে তাহমিনা। মসৃণ সুডৌল শখসাদা পায়ে কালো চিকন ফিতের চটি। হাটবার ভন্দিতে মন্থর ঢেউ উঠছিল সারা শরীরে। মিলিয়ে যাচ্ছিল। ফারুক বলল, কাঠের বাংলো এতবড় হয়, এর আগে আমি জানতাম না।

হ্যাঁ তা বড় বৈকি?

সত্যিই যথেষ্ট বড় বাংলো। লাল রং টিনের ছাদ দেয়া। সমুখে সবটা দৈর্ঘ্য জুড়ে বিশাল প্রশস্ত বারান্দা। বাঁ দিকে একটা সরু প্যাসেজ আছে। আর ডান দিকে আরো কিছুটা চওড়া করিডর। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে প্রথমেই তাহমিনাদের কামরা। তারপরে ডাইনিং হল। বসবার ঘর। তার এক কামরা পরে ফারুকের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর পাশ দিয়ে করিডরটা ভেতর দিকে চলে গেছে। শেষ প্রান্তে বাথরুম। তারপরেই বাঁ হাতে ঘুরলে ভেতর দিকের বারান্দা। এদিকে সমুখের দুটো কামরার প্রশস্ত জুড়ে একটা কামরা। তালাবন্ধ। তারপরে খাবার ঘরে ঢুকবার দরজা। তারপর আবার তাহমিনাদের কামনা করিডরের মুখ বন্ধ করে। দিয়েছে। এই পেছনের বারান্দা থেকে সরু শেড় দেয়া প্যাসেজ চলে গেছে দূরে রান্নাঘরে। ওর পাশেই ছোট ছোট দুটো কুঠিতে খানসামাদের থাকবার ব্যবস্থা।

আগাগোড়া বাংলোর বার দিকটা বটল গ্রীন রংয়ে পেন্ট করা। ভেতরে ক্রীম। তাহমিনা প্রায় সবকটা কামরাই দেখাল। টুকরো টুকরো মন্তব্য করল মাঝে মাঝে ফারুক। তারপর পেছনের বারান্দায় দাঁড়াল ওরা একটুখন। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে রান্নাঘরে কয়েকজন বাবুর্চি রান্না করছে। আবদুল মাঝে মাঝে গিয়ে তদারক করছে তাদের। সবশুদ্ধ বুঝি প্রায় পাঁচ ছজন হবে। ফারুক তাহমিনার দিকে তাকাল আশেপাশের সবুজ আর রৌদ্র থেকে চোখ ফিরিয়ে। বলল, এত উঁচু উঁচু সব থামের ওপর বাংলোটা। বেশ লাগে।

শুধু বেশ লাগার জন্যে নয়। দরকারও। বরষার দিনে নদী বাড়লে তখন পানি প্রায় এদিকটায় এসে পড়ে। তাছাড়া জংলা জায়গা।

বাঘ থাকে বুঝি এদিকে? সাপ?

থাকে, থাকে বৈকি? ওসব কথা বোলো না। আমার ভয় করে বড্ড।

দিনের বেলাতেও?

তবু।

আমি তো আছি। বন্দুক চালাতে জানি, ভরসা রেখো।

তাহমিনা তখন একটা কামরা খুলে বলল, আব এইটে আবিদের বসবার ঘর।

ওইটে বুঝি ওর ছবি?

দেয়ালে একটা বাঁধানো ফটোর দিকে তাকিয়ে ফারুক শুধালো।

হ্যাঁ।

ঢাকায় একবার দেখেছিলুম। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চেহারা।

তাই নাকি?

হাসলো তাহমিনা। জানালা খুলে দিল। সে হাসির বাকা ধ্বনি স্পর্শ করে গেল ফারুককে। সারাটা সকাল এমনি করে ঘুরে ঘুরেই কাটল। সমস্ত বাংলো দেখাল তাহমিনা তাকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তারা ঘাট অবধি। ফিরে এসে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তাহমিনা বলল, তুমি বোসো, বাইরে ডেকচেয়ার পেতে দিচ্ছি। আমি আর এক পট চা বলি তোমার জন্যে। না থাক। শোনো

কী?

একটা জিনিস তুমি আমাকে দেখালে না কিন্তু।

কী ফারুক।

তাহমিনা ওর দিকে তাকাল। যেন চোখের তেরে কিছু আবিষ্কার করতে চাইল।

আবিদের শিকারের কিউরিও। তাহমিনা হঠাৎ চমকে উঠে, শঙ্কিত গলায় বলল, কে তোমাকে বলেছে?

আবদুল—আবদুল বলেছে।

না, সে চাবি আমার কাছে নেই। না, নেই।

সে চলে গেল। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল ফারুক, চাবি তাহমিনার কাছেই আছে। তাহমিনা দেখাতে চায় না বুঝি কামরাটা। কিন্তু কেন? কি আছে ওখানে? কেন, ও এমন করল? অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবু তাহমিনা ফিরল না।

আবদুল ডেক চেয়ার পেতে দিয়ে গেছে বাইরের বারান্দায়। ফারুক সেখানে বসে তাকিয়ে রইল দূরে।

৯. আশরাফ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে

আশরাফ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, আরো সকালে আসা উচিত ছিল আমার। দেরি হয়ে গেলো।

সে–কী। আসুন।

আশরাফ নিজেই ভেতর থেকে আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে পাশে বসলো। বলল, কেমন লাগছে এই এলাকা?

খুব ভালো।

আপনারা শহুরে মানুষ তাই। আমাদের চোখে এর সব বিউটি মরে গেছে। উপমা দিলে বলতে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এর সব দেখেছি আর কোনো গোপন রহস্য নেই।

বলেই উচ্চকণ্ঠে হাসল আশরাফ।

যাকগে সেসব কথা। আঠারো বছর বনে বনে ঘুরে খাস বুনো হয়ে গেছি। আপনাদের এখনো ভালো লাগবে।

ভালো আমার লেগেছে। সকালে ঘাট অবধি গিছলুম।

ও তাই নাকি?

ও দিকে ঘুরে দেখবার ইচ্ছে আছে।

বেশ তো, চলুন না। দাঁড়ান, তার আগে তাহমিনার সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি। কী যে বিপদ হয়েছে আমার!

কী রকম?

এই ফার্ম নিয়ে। আপনি বসুন, আমি চট করে আসছি।

আচ্ছা।

আশরাফ চলে গেলে পর ফারুক আবার ডুবলো তার ভাবনায়। কাল নিস্তব্ধ গভীর রাতের সেই ঘটনার কথা সে ভাবল। একই ছবিকে বারবার ঘুরিয়ে দেখতে লাগল নানান কোণ থেকে। আশরাফ শোবার ঘরের দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকল, তাহমিনা।

বিছানার ওপর উবু হয়ে শুয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল তাহমিনা। হাতে ছিল বই, কিন্তু চোখ ছিল না সেদিকে। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বুকের ওপর শাড়ি ঠিক করতে করতে বলল, আপনি!

হ্যাঁ, কথা ছিল। তোমার সময় হবে?

তাহমিনা দোরপর্দা সরিয়ে ডাকল, ভেতরে আসুন।

না ঠিক বসব না।

বলতে বলতে আশরাফ ঘরের কার্পেট মাড়িয়ে একটা নিচু চেয়ারে এসে বসলো। তাহমিনা কাছে এসে শুধালো, কি বলবেন?

কাল রাতে সেই যে নতুন অর্ডার কটার কথা বলেছিলাম—-

হ্যাঁ।

বেশ বড় অর্ডার সব কটাই

তাহমিনা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

ছ নম্বর প্লট থেকে সাপ্লাই দিতে হবে। সেখানে আমার যাওয়া দরকার। নইলে কাজ হবে না।

তাহমিনা দূরে একটা চেয়ারে বসে বলল, বেশ তো।

তুমি বলছ যাব?

কেন যাবেন না, যা ভাল হয় তাই করবেন।

কিন্তু এদিকে সব একেলা ফেলে? আবিদও হাসপাতালে, ওরই বা কী হয়, সেও একটা ভাবনা। তোমাকে এ সময়ে রেখে যাই কী করে তাই ভাবছি।

আপনি যান, আমার জন্যে ভাববেন না। কবে যাবেন?

গেলে আজকেই। সন্ধ্যেয় বেরুলে কাল প্রায় ভোরে গিয়ে পৌঁছুবো।

আপনি তাই করুন।

কিন্তু বেশ কয়েকদিন দেরি হবে যে।

হোক না। আপনি যান। আবদুল ওরা তো রইল।

বলতে গিয়ে তাহমিনার স্বর একটু কাঁপল। কিন্তু সে অতি সামান্য। আশরাফ বুঝতে পারল না ঠিক। বলল, উনি কতদিন আছেন?

কে? ফারুক?

হ্যাঁ।

তাহমিনা চমকে উঠল। ও কথা শুধালো কেন আশরাফ? না কি সব কিছু জেনে গেছে, তাকে সন্দেহ করছে? তাহমিনা আড়চোখে মুহূর্তের জন্য তাকালে তার দিকে।

কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। দ্রুত কোলের ওপর চোখ নামিয়ে সে বলল, চলে যাবে শীগগীরই। দুএকদিনের মধ্যেই। একটু থেমে বলল, দুর্ঘটনার কথা শুনে অবধি থাকতে চাইছে না।

ও।

আশরাফ যেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল এইটুকু কথা বলে। কিছুটা চিন্তিত দেখাল ওকে। শেষে বলল, এক কাজ করো না, আফিয়া এসে কটা দিন থাক এখানে। তুমিও একেলা হবে না তাহলে, কী বল?

কেন?

তাহমিনার মুখ থেকে হঠাৎ প্রশ্নটা গড়িয়ে পড়ল। আশরাফ তার দিকে তাকাল, অবশ্যি তুমি যদি দরকার মনে না কর, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এমনি বলছিলাম।

তাহমিনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাহলে আশরাফ ওরকম কিছু ভেবে বলেনি। আশরাফ উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে বলল, ভালো কথা, বোট আমি নিয়ে যাচ্ছি। তোমার যদি সদরে যেতে হয়?

সে ব্যবস্থা হবে একটা।

আচ্ছা। কোনো খবর পেলে দেরি করো না, সদরে যেও। কী থেকে কী হয় বলা যায় না। অবিশ্যি আমার যদুর মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। আর ভয়েরই বা কী। তুমি ভেবো না ওসব।

তাহমিনা ম্লান হাসল শুধু প্রত্যুত্তরে।

আশরাফের পেছনে পেছনে তাহমিনা এলো বাইরের বারান্দায়।

আশরাফ সমুখে আসতে আসতে বলল, আসুন ফারুক সাহেব, বেরুবেন বলছিলেন।

হ্যাঁ চলুন। কথা হলো?

হ্যাঁ। আজ বিকেলেই কাজে চলে যাচ্ছি—- এই সন্ধ্যেয়—- ফিরব কদিন পর।

ও।

থেকে যান না কদিন। আমি ঘুরে আসি। ও-ও ভালো হয়ে আসুক। সারা সুন্দরবন আপনাকে চিনিয়ে দিতাম। তাহমিনার দিকে ফিরে বলল, বলো না ওকে থেকে যেতে।

ফারুক তাহমিনার দিকে আধো চেয়ে উত্তর করলো, পারলে থাকতাম বৈকি। আবার আসব।

আশরাফ এবার বলল, তাহলে দুপুরে আমার ওখানেই খাবেন আজকে।

শুধু শুধু আপনি আমাকে টানছেন। তারচেয়ে চলুন। ফারুক সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

আশরাফ বলল, কি বল তাহমিনা?

তাহমিনা প্রায় কিছুই বলল না এর উত্তরে। ফারুক ঠিক রাজি হতে পারল না। অবশেষে বিকেলে চা খাবে এই ঠিক হলো। আশরাফ শেষে বলে গেল, তুমিও এসো তাহমিনা। একসাথেই এসো।

আচ্ছা। আসব। ফারুক, দেরি করো না কিন্তু। কাল রাতে কিছু খাও নি।

এই তো এখুনি এসে যাবে।

আশরাফ ফারুকের হয়ে উত্তরটি দিল।

.

বাংলোর আশেপাশে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াল ওরা। মাঝে মাঝে দুএক ঘর বসত। তার পরেই আবার অরণ্য। এর ভেতর দিয়েই মানুষ তার পায়ে চলার পথ করে নিয়েছে। আশরাফ গাছ চিনিয়ে দিচ্ছিল। বলছিল কী করে তা কাটা হয়, চালান হয়। হাঁটতে হাঁটতেই তার কাছে সে শুনলো সব কিছু। আঠারো বছর আগে কী করে আশরাফ আবিদের বাবার ফার্মে ঢোকে, সে গল্পও করল। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে বেলা হলো বেশ কিছুটা। ফারুক ফিরে এলো। তাহমিনা বলল, দেখলে?

দেখলাম।

নাও এবার গায়ে পানি দিয়ে এসো। গরম করে দিইছি, নইলে নতুন পানি, গায়ে বসে যাবে। পায়ে শ্লিপার গলিয়ে ফারুক একটু হেসে, একটু থেমে, বলল, স্বাস্থ্য বলে যে একটা কিছু আছে আজ তা মনে পড়ল। তুমি না থাকলে তো ঠাণ্ডা পানিই গায়ে দিতাম।

এই করেই তো শরীরটা নষ্ট করলে।

কেন, খুব ভেঙে গেছে নাকি?

কই, না একটু।

তাহমিনা চলে যেতে যেতে বলল। তারপর নিজেই অবাক হলো, ও কথা বলতে গেল কেন? তিন বছরে ফারুক আরো সুন্দর হয়েছে, আরো দৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে কথা কি বলা যায়?

ফারুক কী ভাববে?

খেতে বসে ফারুক বলল, এই বুনো জায়গায় এ সব যোগাড় করলে কোত্থেকে বল তো?

কেন, আমরা কি লতাপাতাই খেয়ে থাকি মনে করেছ?

না, তা কেন? আশা করিনি।

তুমি তো রান্নাঘরে যাওনি। গেলে দেখতে ঢাকার যে কোনো বড় হোটেলের সাথে পাল্লা দেয়া যেতে পারে।

আশ্চর্য!

ওই চপটা নিও। ফেলে রেখো না।

তাহমিনা সমুখে প্লেট এগিয়ে দেয়। একটু পরে বলে, দুপুরে ঘুমুবে তো?

কেন?

শুধাচ্ছি। বিকেলে আবার ওদের চায়ে যেতে হবে না?

না– দুপুরে ঘুমোনার অভ্যেস নেই। খবর কাগজের লোক আমরা, আমাদের ঘুমের কি আর টাইম বেটাইম আছে?

তাহমিনা ওর মুখের দিকে একবার চোখ তুলে পিরিচের ওপর নামিয়ে নিল। ফারুক তাকে একটু খুশি করবার জন্যেই যেন বলল, তাহোক, ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে দিও তাড়াতাড়ি।

আচ্ছা।

আবদুল গ্লাশে স্বচ্ছ ঠান্ডা পানি জাগ থেকে ঢেলে দিল। হাত ধোবার গরম পানি এগিয়ে রাখল সমুখে।

.

বেলা প্রায় দুটো এখন। চারদিক স্তব্ধ। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। শুধু দূর–সবুজ রোদে পুড়ে যাচ্ছে। হলুদ শীটের মত রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে যদুর দেখা যায়। ফারুক বিছানায় শুয়ে ছিল। তন্দ্রা নামছে তার চোখের ভিতরে। এই অরণ্যের সবুজের আঘ্রাণ যেন সে নিতে পারে, এত সূক্ষ্ম এখন তার অনুভূতি। আকাশ পাতাল সে ভাবতে লাগল আধো তন্দ্রার ভিতরে। এমন সময় পায়ের শব্দ। মুখ ফিরিয়ে সে শুধালো, কে, আবদুল?

জি হুজুর, ঘুরে যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। কিছু বলবেন?

আবদুল দোরপর্দার ওধারে এসে দাঁড়িয়ে শুধালো।

এক গ্লাশ পানি।

গ্লাশে ঠোঁট ছুঁইয়ে ফারুক বলল, লেবু কেটে দিয়েছ পানিতে না? তোমার মেম সায়েব কী করছে?

ঘুমুচ্ছেন।

ও।

আচ্ছা আবদুল—-ফারুক আধো উঠে বসলো, তোমার সায়েবের শিকার ঘর কোন দিকে জানো?

কেন? ডানহাতে পেছনের প্রথম ঘরের পরেরটাই তো। আপনি দেখেন নি?

না। আমাকে দেখাতে পারো?

খুব।

মেম সায়েবকে বলে দরকার নেই। ঘুমুচ্ছে। চুপ করে চাবি নিয়ে আসতে পারবে? বকশিস দেব।

আবদুল একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ফারুক মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে দেখবেই কি আছে। ওই কামরায়, যাকে তাহমিনার এত ভয়?—- যার জন্যে সে মিছে অবধি বলেছে, চাবি নেই? ফারুকের বিশ্বাস হয় নি। আবদুলকে চুপ করে থাকতে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও ঘর তুমি কোনোদিন খোলো নি?

খুলেছি হুজুর।

চাবি কোথায় জানো না?

জানি।

তাহলে ভাবছ কেন? আমি শুধু দেখব বৈতো নয়? যাও। ফারুক নিচু গলায় প্রায় তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল। তারপর শ্লিপিং শার্টের বোতাম ধরে অপেক্ষা করল উত্তরের। কিন্তু

কিন্তু কী আবদুল? উনি কিছু বলবেন না। আমি বলে দেব।

আচ্ছা আমি নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে আব্দুল এসে বলল, আসুন। ও ঘরের আরেকটা চাবি আমার কাছেই থাকে। যেন এক রহস্যের রাজ্যে যাচ্ছে, একটু সাড়া পেলেই সব মিলিয়ে যাবে শূন্য বাতাসে; যেন এক অরণ্য–হরিণের শিকারে যাচ্ছে সে, একটু শব্দ উঠলেই সেই ঘাইমৃগী পালিয়ে যাবে এমনি সাবধানে, সন্তর্পণে পা ফেলল ফারুক। আব্দুল পাশে পাশে ফিসফিস করে বলল, সায়েব আমাদের এ এলাকার সবচে নামজাদা শিকারী। একটা টিপও ফসকাতে পারে না ওঁর হাত থেকে, এমনি। আর সে কী শিকারের নেশা। দিন নেই রাত নেই শুধু বনে বনে শিকার আর শিকার।

ফারুক একবার দাঁড়িয়ে কান পাতল তাহমিনা জেগে উঠেছে নাকি। না। সে এবার শুধালো, শুনেছি, আগে নাকি এরকম ছিল না।

হ্যাঁ হুজুর। এই অল্পদিন হলো মাত্র প্রায় এক বছর হবে। এর আগেও যেতেন, খুব কম। তখন বাঘও মেরেছেন। কিন্তু এ বছর চোখে যা পড়েছে, তা আর নিস্তার পায় নি। আসুন। ফারুকের চোখের সামনে অদেখা এক রাজ্যের তোরণ যেন খুলে গেল। মাথার ওপরে স্কাইলাইট। অনেক ওপরে। লাল আর নীল কাঁচের বর্ণালী ছায়া এসে পড়েছে চারদিকে। কখনো কখনো সম্পাত হয়ে সৃষ্টি করেছে বেগুনি আভা। সাঁঝের রঙে যেন ভরে গেছে সমস্ত কামরা। ধূসর আর ম্লান। অদ্ভুত ঠাণ্ডা। বাইরের ঝলসানো রোদের পাশে অবিশ্বাস্য রকমে শীতল। একধারে দীর্ঘ পরিচ্ছন্ন এবং বার্নিশ করা আলমিরায় কয়েকটা বন্দুক খাড়া করে রাখা। ঝকঝক করছে। নীল নীল একটা দ্যুতি বেরুচ্ছে। ইস্পাত কী ঠাণ্ডা। আর ঘরের মাঝখানে বিরাট টেবলের ওপর কার্টিজ শূন্য স্ট্রাম্প পড়ে রয়েছে। কেউ হয়ত ছুঁড়ে ফেলে গেছে। আর তুলে রাখা হয়নি। দেয়ালের নিচু চারটে প্রশস্ত র‍্যাকে রাখা চারটে কুমির। ভেতরে খড় পোরা। মেঘের মত ঘোলা উদাস চোখ তাদের। আর মাথার ওপরে বুনো মোষের মাথা। টনি রঙের পশমওলা। এখুনি হয়ত শিং নেড়ে অন্ধের মত তেড়ে আসবে। ফারুক সম্মোহিত তাকিয়ে রইল। বাঘের পুরু সোনালি ছালটা কী কোমল! ব্যাবিলনের কোনো রাণীর ঘাড়ের ওপরে উজ্জ্বল এমনি চিতার ছাল বুঝি জড়ানো থাকতো শুভ্র মসৃণ পিঠ অবধি। একদিন আবিদের গুলি খেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল আকাশে আক্রোশে, ধনুকের ছিলা ভাঙা মুদ্রায়। তারপর পাকা ফলের মত ঝুপ করে পড়ে গেছে নিঃসাড় হয়ে। মাথার ওপরে খানিকটা গুলির ছেঁড়া চিহ্ন।

মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মুখ লুকিয়ে হাসছে অরণ্যের সম্রাট।

ফারুকের সারাটা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আবদুল কী যেন বলছে, হয়ত শিকারের ইতিহাস বলছে, ভালো করে কানে আসছে না তার। যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। যেন সে রূপোর কাঠিতে ঘুমিয়ে পড়া এক হিংস্রতার নীল দেশে দাঁড়িয়ে।

আলমিরার পাল্লা খুলে ধরল আবদুল। একটু শব্দ উঠল তীক্ষ্ণ। একটা নখ তুলে ধরল সে। বেড়ালের চোখের মত রঙ তার। ভারী অথচ তীক্ষ্ণ। বাঘের নখ হুজুর।

কিন্তু ফারুক অবচেতন মনে অনুসন্ধান করে চলেছে আরো কিছু। সে উদঘাটন করতে চায় সেই রহস্য, যার জন্য তাহমিনা তাকে এ ঘরে আনে নি। বোবা সে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। আবদুল ওটা রেখে দিয়ে এবারে কুমিরের একজোড়া দাঁত তুলে নিল হাতে। আর এমন সময়ে, ঠিক এমন সময় আর্ত, ভীত, মিহি, দুর্বোধ্য চিৎকার শোনা গেল তাহমিনার, আবদুল! ঘুমে সারামুখ থমথমে ভারী হয়ে গেছে তার। কপালের ওপর সেঁটে রয়েছে একগুচ্ছ চুল। আলুথালু শাড়িতে দুপুর ঘুমের ভাঁজ। মুহূর্তকাল তীব্র স্তব্ধ হয়ে রইল তাহমিনা। তারপর ফেটে পড়ল, হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করল, কোত্থেকে চাবি নিয়েছ? কে তোমাকে বলেছে? বেরিয়ে যাও ঘর থেকে বেরিয়ে যাও বলছি আবদুল।

আবদুলের সারা শরীর কেঁপে উঠল। ধরাগলায় একবার মাথা নিচু করে বলল, মেমসাব।

কোন কথা শুনব না, বেরিয়ে যাও।

আবদুল বেরিয়ে গেল। তাহমিনা এসে দাঁড়াল ফারুকের সমুখে। তাহমিনার চোখে ভয়াবহ শূন্যতা। সে পাগলের মত, ভূতগ্রস্তের মত, বলে চলল, কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে? কী দেখতে এসেছো? বল, বল।

ফারুক চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বিহ্বল হয়ে। তাহমিনা কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে? এমন করছে কেন? সে দুহাতে ওর বাহু মূল ধরে ঝাঁকি দিয়ে ডাকল চাপা স্বরে, তাহমিনা, তাহমিনা।

হাত সরিয়ে নিল ও।

চলে যাও এ কামরা থেকে।

কিন্তু গেল না সে। একটু থামল তাহমিনা। তারপর নিমেষে কী যে হয়ে গেল তা ফারুক বুঝতে পারল না। তাহমিনা দুহাতে আলমিরার সমস্ত নখ আর দাঁত ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। বাঘের সেই উজ্জ্বল ছাল ধরে টান দিল! একটু নড়ে স্থির হয়ে গেল ওটা। তারপর কর্ড ছিঁড়ে মঝের ওপর ভাঁজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। আর তাহমিনা বলে চলেছে—- দ্যাখো, দ্যাখো, এইসব দেখতে এসেছ। দ্যাখো, দ্যাখো তুমি।

ফারুক এবার তাকে আঁকড়ে ধরল। উচ্চারণ করল একবার তার নাম। একটু পরে সহসা শান্ত হয়ে এলো তাহমিনা। বুঝতে পারল সে কি করছে। ফারুকের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজের বিছানার ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগল। ছোট ছোট তরংগের মত দেই তার কেঁপে উঠল। সে অনুভব করতে পারল ফারুক এসে দাঁড়িয়েছে কামরায়। ঠিক তার পাশেই। মুখ লুকিয়ে রেখেই কান্নাগলায় বলল, আমি কী করব ফারুক? আমার এ–কী হোলো? কেন আমার এমন হোলো? কেন? কেন?

তাহমিনা, আমি এমন হবে জানলে ওখানে যেতাম না। অজান্তে তোমাকে আঘাত দিইছি। আঘাত তোমাকে আমি দিতে চাইনি।

না, ফারুক না।

কী না, তাহমিনা?

তাহমিনা বালিশ থেকে তবুও মুখ ফেরাল না।

ফারুক অপেক্ষা করল আরো কিছুক্ষণ। কোন কথাই বলল না ও। শেষ অবধি একটু ইতস্তত করে বলল, তাহমিনা শোনো, আমি তারচে চলে যাই।

কেন ফারুক?

চলে যাওয়াই আমার ভালো। আমি যাই।

তাহমিনার সারাটা শরীর শুধু কান্নার অভিঘাতে কেঁপে উঠল আরো। মুখ ডুবিয়ে নিল বালিশের আরো গভীরে। ফারুক কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। তাহমিনা জোরে জোরে দুবার শ্বাস নিল। আর সে ভয় পেয়ে কাছে এসে তার পিঠের ওপর আলতো হাত রেখে শঙ্কিত গলায় শুধালো, কি হলো তোমার তাহমিনা?—-তাহমিনা!

আমার কোন দোষ নেই, আমি কোনোদিন মা হতে পারব না ফারুক। বালিশের ভেতর। থেকে এই অস্পষ্ট উচ্চারিত বিজড়িত কথাটি তীক্ষ্ণ হয়ে এসে বিধল ফারুককে। সে চমকে উঠল। একি বলছে তাহমিনা? সে কি উন্মাদ হয়ে গেছে? নিজের কানকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারল না? পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আর তাহমিনাও যেন বিশ্বাস করতে পারল না নিজের কানকে। যে কথা সে আজ এক বছর হোলো টের পেয়েছে, যে কথা সে বলবার জন্য ফারুককে কাছে চেয়েছে, যে কথা কাল। ফারুক আসা অবধি তাকে মৃদু অবিরাম আগুনে পুড়িয়েছে তা সে উচ্চারণ করেছে। এই প্রথম উচ্চারণ করেছে। আর তার দ্বিধার অবকাশ নেই। আর তার ফেরবার পথ নেই। তাই নিমেষে তার কান্না আর ফোঁপানো থেমে গেল। স্থির হয়ে তেমনি উবু হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নিস্পন্দ পড়ে রইল।

ফারুকের চোখে পড়ল নিমেষের এই পরিবর্তন। গোটা পৃথিবী ধোঁয়ায় ধূসর অস্বচ্ছ অবাস্তব হয়ে এল তার সমুখে। সমস্ত বোধ তার শিথিল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল তাহমিনার চিঠি লেখা থেকে এই মুহর্ত অবধি প্রতিটি ব্যবহার, প্রতিটি কথার অর্থ। টুকরো টুকরো ঘটনা যা অসংলগ্ন বলে একটু সময় আগেই মনে হয়েছিল, এখন তার সূত্র সে যেন উদ্ধার করতে পারল। বিদ্যুতের মত কাল থেকে আজ অবধি তাহমিনার প্রতিটি মুখ ভেসে উঠল। তার মনে হোলো ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সে পারবে না। তার ভীষণ ভয় করলো। সে একটু পর পালিয়ে এলো নিজের কামরায়।

১০. বিকেল যখন হয়ে এলো

বিকেল যখন হয়ে এলো তখন শুয়ে থেকে তাহমিনা ভাবল, আশরাফ বলে গেছে যেতে না গেলে ভালো দেখাবে না। তাছাড়া আজ দুপুরের ঘটনাটা যদি তার কানে যায় আর সে না যায় চায়ে, তাহলে দুয়ে মিলে একটা কিছু হতে পারে। তা হতে দেবে না তাহমিনা। আর সে না গেলে ফারুক যে একেলা যাবে, তারই বা কী মানে আছে?

অবশেষে বিছানা ছেড়ে উঠে—- তারপর এই প্রথম উঠল—- বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে পানি দিয়ে এলো ভালো করে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল রগড়ে। প্রসাধন করল। পরল ফিকে সবুজ জমিনের ওপর পাড় দেয়া শাড়ি আর সাদা সার্টিনের ব্লাউস। আবদুলকে ডেকে বলল, ফারুককে তৈরি হয়ে বেরুবার জন্যে খবর দিতে। না, সে সঙ্কোচ করবে না।

দুজনের দেখা হোলো। কথা বলল না। চুপচাপ নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে তারা। হাঁটতে লাগল। পথের দুপাশে বেতের কচি সবুজ পাতা। ইতস্তত শাল আর সুন্দরী। এদিকে বন। ঘন নয়। এদিকে মানুষের বসতি আছে। সব কেমন যেন চুপ এই মুহূর্তে। গাছের পাতাও নড়ে না। পাখিও ডাকে না। যে বনে পাতা পড়ে কুলো হয় সেখান থেকে কোনো আওয়াজও আসে না। সমস্ত এলাকাটা শুধু স্তব্ধ। দুএকটা বসত বাড়ির উঠোন কী অসম্ভব রকম তকতকে, ঠাণ্ডা আর নিঃশব্দ। দুজনেই যেন বধির হয়ে গেছে এমনি চুপচাপ, তাদের যেন আর কিছু ভাবার নেই এমনি নিশ্চিন্ততায় পরস্পর হেঁটে চলল।

ফারুকের মনে এখন নেই আতঙ্কের স্বাদ, নেই ভীত অনুভূতি। তাহমিনার ভাবনা এখন খর নদীর স্রোতের মতন।

দুজনের স্তব্ধতা এখন মুখোমুখি।

তারা এসে পৌঁছুলো। আশরাফ তখন তৈরি হয়ে নিয়েছে, ওদের সাথে চা খেয়ে একসাথে বেরুবে। ওরা বাংলোয় যাবে। আর সে বোটে করে ছনম্বর প্লটে। আশরাফ দূর থেকে দেখেই এগিয়ে এল। বলল, আসুন, আসুন। এসো, তাহমিনা। খোকা, তোর আম্মাকে খবর দিয়ে আয় তো।

ওরা যখন গিয়ে বসলো বসবার ঘরে, তখন তফিয়া এলো। অত্যন্ত কম আসবাবে সাজানো প্রসস্ত কামরা। নিচু আর গভীর বসবার আসন। একধারে আলমিরায় কিছু বই। দেয়ালে একটা চিতল হরিণের ছাল ঝুলিয়ে রাখা। ফারুক আর তাহমিনা সেদিকে তাকাল, নামিয়ে নিল দুজনেই দৃষ্টি। তারপর ফারুক চোখ ফেরালো আফিয়ার দিকে। ভারী, গোলগাল, স্নেহময়ী মানুষটি। গালের গভার ট্রোল আর ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসি লেগেই আছে। উজ্জ্বল ফর্সা রংয়ের সাথে চাপা রংয়ের শাড়িটি মানিয়েছে অপূর্ব। পান খেয়েছেন কখন, এখনও ঠোঁটজোড়া স্বচ্ছ লাল হয়ে আছে। দেখলে শ্রদ্ধা হয়, দুদণ্ড বসতে ইচ্ছে করে। আফিয়া তাহমিনাকে শুধালো উদ্বিগ্নস্বরে, কী হয়েছে তোমার বলো তো?

কই, কেন, কিছু নাতো।

কিন্তু মুখ কেমন ভারী দেখাচ্ছে দেখছি।

ফারুক অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। তাহমিনা উত্তর করল, দুপুরে শুয়ে শুয়ে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি তাই।

ও।

কিছুটা শঙ্কিত স্বরে আফিয়া অনুমোদন করলো।

তারপরেই সহজ হয়ে এলো আবহাওয়া। বিকেলের চায়ের নামে আফিয়া যা করেছে তাকে ফারুক আর বিকেলের চা বলতে সাহস পেল না। হাতে তৈরি তিন রকম মিষ্টি থেকে শুরু করে, পরোটা, কিছুটা ঝাল আর নিখুঁত করে বানানো চা। বসে বসেই ফারুক শুনলো ওদের সংসারের গল্প। বড় দুছেলে চাটগাঁয়ে আছে। বোর্ডিং থেকে পড়ছে। আশরাফ চায় না ওরা এই বুনো ব্যবসা ধরুক। তারপর এক মেয়ে ছিল, সে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। সে কথা বলতে গিয়ে আফিয়ার চোখ কিছুটা ভিজে উঠলো আজো। দেয়ালে সেই মৃতা কন্যার ছবি। কিশোরী তনুতে সে সখ করে পরেছে বার্মিজ দেহাভরণ। আর তাইতে লাজুক দেখাচ্ছে আরো। তারপরে এই ছেলে। ওদের সাথেই এখনো আছে। আফিয়া দুবেলা পড়ায়। বড় হলে তাকেও পাঠিয়ে দেবে চাটগা কী ঢাকায়।

এই ছোট্ট সংসারের কথা শুনতে শুনতে ফারুক ভাবল, তাহমিনা কি ভাবছে এখন? সে আড়চোখে তাকাল তার দিকে। গভীর আগ্রহ নিয়ে, যেন নতুন কোন গল্প শুনছে এমনি তন্ময়তায় সে শুনছে। আর তার উন্নত বুক ছোটখাট ফুলে উঠছে মৃদু নিঃশ্বাসের দোলায়। অবশেষে উঠবার সময় হোলো। আফিয়া বলল, তাহমিনা থাক। অনেকদিন আসেনি। আমরা দুজনে গল্প করি। আবদুল এসে নিয়ে যাবে। আর আপনি আর একবার আসবেন।

ফারুক এইখানে হেসে বলল, দেখি। তরপর বলল, আসব নিশ্চয়ই।

আশরাফ বলল, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি ভেতর থেকে আসছি। এক সাথেই বেরোই। সবাই চলে গেলে ফারুক একেলা বসে রইল সেই কামরায়। শুধু মাত্র সে। এই মুহূর্তে সে অনুভব করতে পারল তার সত্ত্বাকে, তার পৌরুষত্বকে। সেই শঙ্কা যা সারা বিকেল তাকে ভর করে ছিল, এখন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। অনুভব করল সাহসের স্বাদ। সে কিছুতেই তাহমিনাকে এমনি করে একটি নিষ্ফল আকাক্ষার মত মরে যেতে দেবে না। না—-তাকে সে মরতে দেবে না। আস্তে আস্তে এই সিদ্ধান্তের অনুরনণ যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার সারাটা শরীরে। তার চোখ স্থির নিবদ্ধ হলো মেঝের একটি বিন্দুতে। সে ভাবল। সে তাহমিনার কথা ভাবল। তাহমিনা কত বদলে গেছে তবু সে তার সেদিনের তাহমিনা। পার। হয়ে এসেছে তারা দীর্ঘ একটি সময়ের ব্যবধান তবু এই ব্যবধান—-আজ এক মুহূর্তে এমন কি অকারণে, এই কামরায়, বিলীন হয়ে গেল। অদ্ভুত এক ভাবনা তাকে মৃদু বিস্মিত করলো যেন সে এ কামরায় আজ নতুন আসেনি, বহু দিন বহু কাল ধরে আসছে, আবিষ্কার করেছে ঠিক এই কামরায় এই একই চেয়ারে ঠিক

এমনি ভঙ্গিতে বসে মেঝেতে চোখ রেখে হৃদয়ের একেকটা উপলব্ধি, যেন জন্মান্তর থেকে এখানে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে, আজো নিয়েছে। এমনি সহজ, এমনি ঋজু। কোনো অভাবনীয়তা নেই। কোনো। সংশয় নেই। একদিন সে তাকে ভালবাসতো। হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছে আজো তাহমিনাকে সে ভালবাসে। আরো আপন করে, আত্মার মুখোমুখি তাকে সে ভালবাসে।

একটু পর আশরাফ এলো। ও চমকে উঠে দাঁড়াল দ্রুত পায়ে। শুধালো, আপনার জিনিস পত্র?

আগেই বোটে চলে গেছে।

ও।

আশরাফকে সে এগিয়ে দিয়ে এলো ঘাট অবধি। আস্তে আস্তে বোট ছেড়ে দিল। পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আশরাফ হাত নাড়ল। সেও প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল। বোটমাঝি গফুর হাত তুলে। সালাম করল তাকে।

ফারুক অবসাদের ভঙ্গিতে হাত নামালো। মুখ ফেরাল বাংলোর দিকে। আবদুল পেট্রোম্যাকস জ্বেলেছে। উজ্জ্বল আলো তার চোখে আসছে এখান থেকেই। প্রথম সন্ধ্যে। আকাশে দুএক টুকরো মেঘ। একটি বড় তারা। দুদিকে শাল আর সুন্দরী গাছ দূরে দেয়ালের মত সিধে ওপরে উঠে গেছে। আর তারি পাতা বিছানো পায়ে চলা ফিরতি পথ

ধরল ও। রক্তের ভিতর অনুভব করল—- অরণ্যের এক অদ্ভুত রহস্যময় আকর্ষণ আছে। সে শুধু কাছে টানে। কাকে যেন টানে। জড়িয়ে ধরতে চায় অমোঘ অলস মৌতাতের মত। ইচ্ছে হয় এখানে এই ভিজে ছায়ায় শুয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে। অথবা হারিয়ে যেতে এই অরণ্যে। এখানে যারা আসে, তাদের কোনো দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, বাধা নেই, সংকোচ নেই। কিছুই নেই। সমস্ত মুখোশ খুলে আদিম নগ্ন মানুষ হয়ে ওঠে তারা। ফারুকের রক্তের ভিতরে অণুতে অণুতে প্রবাহিত হয়ে গেল এই গান।

১১. পেট্রোম্যাক্স নিভে গেছে

পেট্রোম্যাক্স নিভে গেছে। এখন তাহমিনার ঘরে জ্বলছে রাত দশটার বেডল্যাম্প। নিঝঝুম হয়ে গেছে চারদিক। শুধু দূর দিগন্ত থেকে কিসের একটা একটানা ধ্বনি আর নদীর জল বয়ে যাবার ঝাঁপসা আওয়াজ। কোথাও কেউ নেই। তাহমিনার দীর্ঘ কামরার দূর কোণায়। বেডল্যাম্পের আলো ভালো করে পৌঁছায় নি। সেখানে প্রায় অন্ধকার। খাটের উপচ্ছায়া। ফারুক দূরে বসেছিল একটা মখমল ঢাকা সোফায়। খোলা জানালা দিয়ে অস্পষ্ট রাত্রি। ফারুক ঘরের দূরতম কোণে চোখ রেখে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, তুমি এ বিয়েতে সুখী নও তাহমিনা?

তার গলার স্বরে এত অবসাদ যে প্রশ্নটা প্রশ্ন বলে মনে হোলো না। স্বগত উক্তির মত শোনাল।

তাহমিনা বসেছিল খাটের ওপর। বাঁ হাতে হেলান দিয়ে। শুভ্র সুন্দর নিটোল বাহু তার এসে বিছিয়ে পড়েছে কোলের ওপর। মুখরেখা গড়ে উঠেছে মিহি আলোয়। এখন সে একবার মুখ তুলে তাকাল। উজ্জ্বল চোখ তার দেখাল কাঁচের বাটিতে রাখা স্বচ্ছ পানির মত। বলল, তোমাকে ঢাকা থেকে ডেকে এনেছি বলে তুমি অবাক হয়েছ, তাই না? ফারুক চুপ করে রইল।

কিন্তু তুমি জান না এই এক বছর আমি কী করে কাটিয়েছি। তোমার মনে আছে ফারুক? একবার বিয়ের আগে তোমায় বলেছিলাম এ হয়ত আমার আত্মহত্যা।

হ্যাঁ।

সে কথাই যে সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তা আমি ভাবিনি।

তুমি আশা করছিলে, তুমি সুখী হবে?

তাহমিনা যেন লজ্জিত হলো।

হ্যাঁ।

তোমার ভালোবাসা?

সেও সত্যি ছিল।

তাহলে?

আমি কিছুই বুঝতে পারি নি সেদিন।

আমিও পারি নি। তাহমিনা, তোমাকে আমি আজও ভালবাসি।

তাহমিনা কোনো কথা বলল না। ফারুক বলল, মনে পড়ে, তুমি একদিন বলেছিলে, ওকথা শোনাও তোমার পাপ?

ফারুকের দিকে চোখ তুলে তাকাল তাহমিনা। স্পষ্ট দেখতে পেল তাকে। বিরাট কামরার ভেতরে একটু ছোট দেখাচ্ছে ওকে। দূরে আয়নায় আরো ছোট হয়ে পড়েছে ওর প্রতিচ্ছবি। ফারুকের কপালে টলটল করছে কয়েক ফোঁটা ঘাম। শুকনো হয়ে গেছে ঠোঁটজোড়া। তাহমিনা জানে তার নিজের কথা। তার নাকের সমুখে এখন সঁচের চোখের মত ছোট ছোট ঘাম জমছে। আর কানের পেছনে। যে কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে। সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করল তাহমিনা। কিন্তু পড়ল না। অবশেষে বলল, আজ স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই ফারুক। তারপর একটু থেমে বলল, একটা কথার জবাব দেবে?

কী?

আমাদের জীবনে আমরা কী চাই?

ফারুক একটু একটু করে প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলল, বিশ্বাস, শান্তি আর ঐশ্বর্য। আমিও তাই চেয়েছিলুম ফারুক। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার।

অনেকক্ষণ থেমে ফারুক শুধালো, আজ দুপুরের সে কথা কি সত্যি তাহমিনা?

হ্যাঁ। আবিদ আমাকে তা দিতে পারে না।

কী করে জানো?

তাহমিনা অদ্ভুত হেসে বলল, আমি জানি।

তাহমিনা—-

কি হবে আমার ঐশ্বর্য দিয়ে? কী লাভ

হঠাৎ তাহমিনার চিবুকে সেই ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। সে থামল। যে কথা সে উচ্চারণ করেছিল তা কামরাময় ঘুরে বেড়াল। প্রতিধ্বনি হয়ে জেগে রইল। আর ফারুক জানতে পারল এখুনি সে বলবে——- সব কিছু বলবে তাকে। সে অপেক্ষা করে রইল।

প্রথম সন্দেহ হয়েছিল বছর দেড়েক আগে। তাহমিনা জিজ্ঞেস করেছিল আবিদকে। আবিদ হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। কিন্তু একবার যখন প্রশ্নটা উঠেছে, তখন সন্দেহ তার মনেও গম্ভীর হয়ে উঠল। তখন থেকেই শুরু। তাহমিনা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর একদিন আবিদ চলে এসেছে ঢাকায়। সবচে বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। রিপোর্ট তিনি লিখে দিলেন, ভালো হবার কোনো আশা নেই। আবিদ যখন ফিরে এলো তখন তার চেহারা দেখেই সব অনুমান করে নিতে পেরেছিল তাহমিনা। কিন্তু জিগ্যেস করলে আবিদ বলেছে, ওটা একটা সাময়িক ব্যাপার। ওষুধ দিয়েছে, কোনো ভয় নেই।

তুমি লুকোচ্ছ নাতো?

আবিদ জোর করে হাসি টেনে উত্তর করেছে, তোমার কাছে লুকোবো মিনু?

একদিন পরেই তাহমিনার কাছে সব উঘাটিত হয়ে গেল। একদিন আবিদের সেফ ড্রয়ার কী কারণে খুলেছিল। সেখানে রাখা ছিল সেই মেডিক্যাল রিপোর্ট। কিছুই সে করে নি। ভাঁজ করে ওটা আগের জায়গাতেই রেখে দিয়েছে। আবিদ সন্ধ্যের সময় এলে পর, তাহমিনার গম্ভীর মুখ দেখে শুধিয়েছে, কী হলো আবার তোমার?

তুমি আমার কাছ থেকে লুকোলে কেন?

আবিদ চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠল, সেফড্রয়ার খুললে কেন তুমি?

আমার অধিকার আছে বলেই। কেন তুমি লুকোতে গেলে?

সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি?

হ্যাঁ।

না, তোমাকে দেব না।

চিৎকার করে কথাটি উচ্চারণ করে উন্মত্তের মত আবিদ তার সমুখে থেকে চলে গিয়েছে। তারপর থেকেই দুজনে অসম্ভব দূরে সরে গেল এক মুহূর্তে। এক বিছানায় শুয়েও যেন দুজন দু মহাদেশের অধিবাসী। আবিদ উন্মাদ হয়ে গেল তার বন্দুক নিয়ে। দিন রাত অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে তার ব্যর্থ পৌরুষত্বের শোধ নিতে লাগল। চোখের দৃষ্টিতে তার হিংসা। আর দিনে দিনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল তাহমিনা। ব্যর্থ কান্নায় সে ডুবে গেল। সমস্ত ঐশ্বর্য তার কাছে তুচ্ছ।

সেদিন যখন আহত হয়ে আবিদ ফিরে এল জ্ঞানশূন্য অবস্থায়, তখন ভয়ে তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে। সমস্ত বোধ তার লুপ্ত হয়ে গেছে। তাহমিনা প্রার্থনা করল মরে যাবার জন্যে। প্রার্থনা করল এই হিংস্রতা আর আঁধি দেয়ালের দেশ থেকে তার মুক্তির জন্যে। তখন যদি আবিদের মৃত্যুও হোত তার চোখের সমুখে, তবুও তার এতটুকু বিকার দেখা দিত না। ঘৃণায় ধিক্কারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল তাহমিনা।

ফারুকের সোফার পাশেই ছিল রেডিও সেট। ব্যাটারি থেকে লাল আর নীল সরু তার উঠে এসেছে। তাহমিনা উত্তেজিত অথচ ফিসফিস স্বরে যখন বলে যাচ্ছিল এই ইতিহাস, তখন ফারুক চোখ নিচু করে রেডিওটার দিকে তাকিয়ে ছিল সারাক্ষণ। একসময়ে অন্ করে দিল সে। আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দেখল সমস্ত স্টেশন। বিচিত্র দুর্বোধ্য স্বচ্ছ জল অভিঘাতের নিচু শব্দ উঠতে লাগল। তাহমিনা একটু থামল। তারপর বলল, সকালে ওকে সদরে রেখে আসবার পর কী করে যে সময় আমার কেটেছে, তা তোমাকে কী করে বোঝাই!

তারপর তুমি আমার কাছে লিখলে?

হা। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না ফারুক। তুমি আমাকে ঠেলে দিও না।

হঠাৎ সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ল সুর মূচ্ছনা। মিহি তার ধ্বনি ভাসিয়ে দিল কামরার রুদ্ধ বাতাস। অলস গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর। ফারুক ভলুম কমিয়ে দিল। শুধু অনুভব হয়ে রইল সেই সংগীত। রক্তের ভেতরে জাগলো এক রিমঝিম। ফারুক বলল, পলিনেশিয়ার মোআনা মেলডি বাজছে।

তাহমিনা একটুখন চুপ করে রইল। মৌতাতের মত জড়িয়ে ধরল তাকে সেই সংগীত। সে উচ্চারণ করল, তুমি কি বোঝো না?

আমি বুঝি তাহমিনা। কিন্তু আবিদ রয়েছে যে।

আমি ওকে আর ভয় করি না।

সে কী করে হয়?

তুমি কাপুরুষ।

তাহমিনার স্বর শোনাল সেই অর্কেস্ট্রার একটা মিষ্টি যন্ত্রের ধ্বনির মত।

আমাকে ভাবতে দাও।

আর কবে?

তবু।

না।

বলতে বলতে তাহমিনা শুভ্রশয্যায় এলিয়ে চোখ বুজলো। মেঝের লাল কার্পেট আগুনের মত জ্বলে উঠল ফারুকের চোখে।

পলিনেশিয়ার প্রবাল কি এমনি লাল? সেখানে সেই পাম আর রবার বনে আজ নীল জোছনা। সাদা শীটের মত সমুদ্র আর বালিয়াড়ি। সেখানে উদ্দাম নৃত্য ভঙ্গিমায় শৃঙ্গারের মুদ্রা আজ। কুরঙ্গের মত গতি সেই নর্তক আর নর্তকীদের। আর ইউকেলেলির বুক স্পর্শ করা ঝংকার। অ্যাকর্ডিয়নের একক ধ্বনি তরংগ। কখনো সেই সুরতরংগ অলস মন্থর হয়ে আসছে, তারপর পরমুহূর্তেই একরাশ উজ্জ্বল শুভ্রতার মত চূর্ণ চূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত ছিটিয়ে পড়ছে। রক্তের জোয়ারকে আহত করছে ক্রমাগত। পলিনেশিয়ার জোছনা কি নীল? তার বালুকা বেলা কি শুভ্র? তার রবার বনে স্বপ্ন মর্মর?

ফারুক সেই মূর্ছনায় ভেসে গেল। বিস্মৃত হলো। সে বলল, আমি আর ভাবি না তাহমিনা। তাহমিনা একটুও নড়ল না। তেমনি চোখ বুজে পড়ে রইল। কিছু বলল না। সে কি শুনতে পায়নি ফারুকের স্বর। আজ সে সব বলেছে, আর তার কোনো ভাবনা নেই। সে মুক্ত। সমস্ত ভার তুলে দিয়েছে ফারুকের কাছে। এই সুরতরংগ শুধু অনুভব করা যায়। এখানে শুধু নিমগ্ন হয়ে যাওয়া যায়। ধীরে ধীরে একটা সুর স্পষ্ট হয়ে রইল তার কাছে জড়িয়ে ধরল—- বুঝতে পারল তার নাম ফারুকের সান্নিধ্য।

তার এক মুহূর্ত আগেই বুঝতে পেরেছে ফারুক। কোমল শব্দ উঠল সোফা থেকে। তাহমিনা স্বপ্নের ভিতর থেকে শুনতে পেল তার পদশব্দ। সে শুনলো।

ক্ষণকাল সে নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে সে ঠোঁট খুলল। মুখ নামিয়ে আনল ফারুক। এক হাতে নিভিয়ে দিল ল্যাম্প। অনেকক্ষণ। ফারুকের হাত তার খোঁপার গভীরে। আর. একটা হাত তার পিঠের আড়ালে। অনেকক্ষণ পড়ে রইল তারা। মোআনা মেলডি যেন হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে আসছে এই অন্ধকার কামরায়।

চোখ মেলল তাহমিনা। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল তারা খাটের কেন্দ্রে। ফারুকের কপালে স্বেদবিন্দু। চোয়ালের হাড় ফুটে বেরিয়েছে। কঠিন হয়ে গেছে। সে তাকে বাহুবন্ধনে বাঁধল। আর তারপর তাহমিনা তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল অন্ধকার সিলিং। কাঠের বিমগুলো দূরে, প্রায় একটি বিন্দু থেকে, দ্রুত সমুখে এগিয়ে এসেছে এসে তার দেহের

দুদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ফারুকের কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে তার চিবুকের নিচে সিফনের মত যে বঙ্কিমতা—- তাহমিনা অনুবভ করল এক আশ্চর্য নদীর হঠাৎ প্রবাহ। গেল। কিন্তু তাকে কৃতজ্ঞ করে দিয়ে গেল। যা সে পায়নি, এতকাল, পায়নি এমন কি যা পাবার আশা সে ছেড়ে দিয়েছিল, তা যেন হঠাৎ কেউ তাকে দুহাত ভরে দিয়ে গেল। কৃতজ্ঞতায়, তৃপ্তিতে, মুক্তিতে, বিশ্বাসের অসীমতায় মুহূর্তকাল আগে কঠিন হয়ে আসা শরীর তার কোমল কোমলতর হলো কেবলি। এমন কী তার মনে হলো, ঠিক এমনি করে, এই রাত্রি এই সময়ের অনন্ত পেরিয়ে, সে কেবলি রূপান্তরিত হবে কোমলতায় বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নতর হবে কোমলতায় প্রসারিত হবে সমস্ত অনুভূতি শাসিত মহাদেশে এবং তখন তার এই অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু থাকবে তার অলৌকিক বিশাল কোমলতার মত এই কেবলি ছড়িয়ে পড়া, বিস্তৃত হওয়া একটি অস্পষ্ট কিন্তু সীমাহীন বিস্তৃতি।

এর বহুক্ষণ পরে নিজেকে মুক্ত করে উঠে বসলো তাহমিনা। কানের ঝুমকো ঠিক করতে করতে তাকাল ফারুকের দিকে। পাশেই সে শুয়ে। মাথার পেছনে তার হাত জোড়া করে রাখা। চোখ অলস মোদিত। কপালে সেই স্বেদ বিন্দু ঘন হয়ে দেখা দিয়েছে। তাহমিনা জানে তার কানের পেছনেও আঁকাবাঁকা রেখায় স্বেদ এখন গড়িয়ে যাচ্ছে। দুজনে তারা পরস্পর তাকিয়ে রইল। ফারুক জড়িত গলায় বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি তাহমিনা। তারপর ওকে আবার আকর্ষণ করে, বক্ষের সন্ধিস্থলে চুমো আঁকল। তাহমিনা মৃদু দোলায় এগিয়ে এলো আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে। সে তার উত্তাপ, তার ভালোবাসাকে অনুভব করতে চায়। নিঃশেষ করে দিতে চায়।

.

নিঃশব্দে দরোজা খুলে পায়ের পাতার ওপর ভর করে বেরিয়ে এলো ফারুক আর তাহমিনা। তাকাল ইতস্তত করে। অন্ধকারে আবদুলের ঘরেও বাতি নেই। বাতাস বইছে পাতার ভিতর দিয়ে। হিম হিম বাতাস। ভালো লাগা বাতাস। ফারুক ফিসফিস করে শুধালো, কেউ জেগে নেই তো?

দূর।

আবদুল?

কখন ঘুমিয়েছে। তা ছাড়া শোনা যায় না।

আমার খেয়াল ছিল না।

আমারও না।

ল্যাম্প হাতে করে তাহমিনা বাথরুমে ঢুকে দরোজাটা আস্তে শুধু ভেজিয়ে দিল। ফারুক বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। একটু পরে কানে এলো তার সাবধান পানি ছিটানোর শব্দ। তারপর সাবান ফেনায় হাত ঘসবার মসৃণ আওয়াজ। আর একটা মৃদু মিষ্টি গুনগুন। তারপর থামিয়ে তাহমিনা শুধালো গলা বের করে, তোমার ভয় করছে নাতো?

উঁহু।

ঠিক করে বল।

নাঃ। আর করলেই বা।

ফারুক বুঝতে পারল। দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো। তাহমিনা টাওয়েল দিয়ে সারা শরীর চট করে ঢেকে বলল, ছেলেমানুষের মত, উম্‌, না না, এসো না।

আমার ভয় করছে বাইরে।

মিথ্যেবাদী। দ্যাখো, দ্যাখো, পড়ে যাব যে।

তাহমিনার গায়ে পানি ঢেলে দিল ফারুক। হেসে উঠল ও। আর সেই হাসির সাথে সাথে বুক থেকে কয়েক ফোঁটা পানি ছিটিয়ে পড়ল। শুকনো একটা টাওয়েল নামিয়ে ফারুক ওর পিঠ ঘষতে লাগল জোরে জোরে।

না, না, মরে যাব। যাঃ লাগছে। ছাড়ো।

চুপ।

দুজনেই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। সব কিছু যেন ভুলে গেছে। শুধু এখনকার এই মুহূর্ত যেন সত্যি আর সব অবাস্তব। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে শীতল হয়ে এলো তাদের সমস্ত দেহ। সজীব হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালল। সবকিছু যেন ধুয়ে মুছে গেছে। ঝরঝরে আর হালকা লাগছে। বাতাসটা কী মিষ্টি! নতুন করে দুজনকে চিনল যেন এখন ওরা। ফারুক শুধালো টাওয়েল দিয়ে তাহমিনার দেহ মুছিয়ে দিতে দিতে, কেমন লাগছে মিনু?

এই তিন বছর বাদে ফারুক প্রথম ডাকল তাকে মিনু বলে। তাহমিনা ঘাড় ফিরিয়ে প্রায় ওর মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে প্রতিবাদ করল, দূর, আমাকে মিনু বলে ডেকো না।

কেন?

মনে হয় এখনও ছোট্ট রয়ে গেছি।

খুব বড় হয়েছ, না?

তাছাড়া কী?

একটুও না।

বলেই হেসে ফেলল ফারুক। হাসল তাহমিনা। তারপর হঠাৎ থামল। স্পর্শের ভাষায় কী কথা যেন সঞ্চারিত হয়ে গেল দুজনের ভেতরে। তারা তাকিয়ে রইল দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে। ফারুক ওকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুমো আঁকল নতুন করে। তারপর আবার তাকিয়ে রইল পরস্পর।

এক হাতে আঁচল ঠিক করতে করতে অন্য হাতে বেডল্যাম্প নিয়ে বেরিয়ে এলো তাহমিনা। থামল। বলল, রাত অনেক হয়েছে। এবার শুতে যাও।

১২. দূর থেকে দেখেই খোকা দৌড়ে এলো

দূর থেকে দেখেই খোকা দৌড়ে এলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, এই, এই, আম্মা ডাকছে। তাহমিনা প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে বলল, এই কিরে বাবু? এই কি? আপা বলতে পারিস না! দাঁড়াও তোমার আম্মার কাছে বলে দিচ্ছি।

আশরাফের ছোট্ট ছেলে খোকা এবার লজ্জিত হলো। ছাড়িয়ে যেতে চাইল তাহমিনার আদর বাহুবন্ধনকে। সে উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি করে শুধালো, যাবে নাকি?

যাবে? চল।

বিকেলে বেরিয়েছিল ফারুক আর তাহমিনা। বাংলোর সমুখ দিয়ে যে পথ গেছে সেই পথ। ধরে। আধমাইলটাক গেলে পর হাট পড়ে। সেই হাটে যাবে।

পড়তি দুপুর বেলায় যখন ফারুক পেছনের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল তখন তাহমিনার সাথে দেখা। একটু গড়িয়ে মুখে চোখে পানি দিয়ে ফিরছিল ও। পিঠের ওপর এলিয়ে দেয়া চুল চিকচিক করছে একটু। শাড়ির আঁচল সারা গায়ে আঁট জড়ানো। ও বলেছে, হাট দেখতে যাবে নাকি? বলছিলে যে তখন।

চল না, বেশ হয় তাহলে। কখন?

আর একটু পরে। তৈরি হও তুমি।

তাহমিনা পড়ল রূপোলি তারা বসানো সাদা শাড়ি–রূপোলি বর্ডার দেয়া। আর ফারুক পরল তার সবচে হালকা পোশাক—-গলা খোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা। জরির কাজ করা স্যান্ডেল জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এলো। তাহমিনা বলল, যাই বলো, চিরকাল তুমি সৌখিন মানুষ।

নাকি?

ফারুক হাসলো। তারপর কেমন ধীরে ধীরে দুজনে ধরল পায়ে চলা পথ। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর ফারুক বলল, এক মধুপুরের গড় ছাড়া অরণ্য আমি কোনোদিন দেখিনি।

সুন্দরবন তোমার ভালো লাগবে। তোমার মনের মত জায়গা।

কেন বলো তো? ফারুক শুধালো।

তাহমিনা ভ্রূ নাচিয়ে উত্তর করল, অরণ্যের প্রতি তোমার আশ্চর্য দুর্বলতা আছে। মনে পড়ে কবিতা লিখেছিলে?

হাসল ফারুক। বলল, ভুলিনি। একটা মজার কথা মনে পড়ল। হালি একবার কি লিখেছিলেন জানো? ওয়ার্ডস্বার্থকে যদি ঘন ট্রপিক্যাল ফরেস্টে ছেড়ে দেয়া হতো, তাহলে তার কাব্যিপনাও নিমেষে শিকেয় উঠে যেত।

প্রত্যুত্তরে তাহমিনা মৃদু হাসি ছড়ালো সারা মুখে।

আরো কিছুক্ষণ চলবার পর ফারুক বলল, কাল রাতে আমার মন কেমন করছিল।

কখন?

শুতে এসে।

কী হয়েছিল?

কেউ যদি জেনে ফেলত?

তাহমিনার গতি শ্লথ হয়ে এলো। একটু পরে সোজাসুজি তাকিয়ে কোমল স্বরে শুধালো, তুমি অনুতপ্ত?

না, তাহমিনা।

তারপর নীরব হয়ে গেল দুজনেই। আরো কিছুক্ষণ চলবার পর তাহমিনা বলল, ওখানে না গেলেই নয়?

কী এমন।

তাহলে থাক। আরো অনেকটা হাঁটতে হবে। এরচে একটু বসিগে কোথাও।

কোথায় বসবে? ফিরতে হবে কিছুদূর, ফেলে এসেছি পেছনে।

একটা চেনা জায়গা আছে আমার। চল।

কাজ নেই তাহলে।

আবার ওরা ফিরতি পথ ধরলো। হাটমুখে চলেছে দুএকজন লোক। কাঁধে তাদের হাটের পশরা। একজনের কাঁধে বাঁকের দুধারে সাবানের বাক্স ঝোলানো। ফারুক জানে মনোহারি জিনিসে এটা সেটায় ভর্তি বাক্স দুটি। চার পয়সা দামের, গোল আয়না থেকে শুরু করে ছআনা দামের বিরহ–মিলন পত্রাবলী অবধি। কাঁচা ঝিয়াড়ীর মনকাড়া কাঁচের চুড়ি আর শস্তা সুগন্ধ। গ্রামের হাটে বিক্রি হতে চলেছে। লোক কজন তাহমিনাকে দেখে সালাম করল। তাহমিনা দিল তার প্রত্যুত্তর মিষ্টি হেসে। একজনকে শুধালো, ভালো আছো?

ফারুক বলল, তোমাকে ওরা চেনে দেখছি।

বাঃ চিনবে না। তারপর বলল, ভারী সরল মানুষ ওরা। তোমরা শহরে লোক তা ধারণাও করতে পারবে না।

পথ থেকে নেমে ডান হাতে কিছুদূর এগিয়ে এলে—-এদিকে খুব বেশি কেউ যাতায়াত করে না—- একটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে। একটা নিচু জমিতে জমেছে পানি। তারি খাড়াইয়ে একটা বিরাট বুনো গাছ। আর তারি ছায়ায় বসলো দুজনে।

একটা ছোট্ট মেঠো ফুলের গাছ তুলে ফেলতে ফেলতে ফারুক শুধালো, এর পরে কী করবে তুমি?

আমাকে কেন সে কথা জিগ্যেস করো।

তবুও।

আর তবুও না ফারুক।

এতটুকু আবেগ নেই তাহমিনার বলনে। অত্যন্ত একটা সাধারণ কথা যেন বলছে এমনি তার সুর। ফারুক তার মুখের দিকে তাকাল। তাহমিনা বলল, আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

ফারুক কোনো উত্তর করল না।

তোমার ভয় করছে ফারুক?

না।

তুমি সব শুনেছ। সব তোমাকে বলেছি। জোয়ার যখন আসে তখন ভয় করলে চলে না। আমি তুলে দিইছি আমার সবকিছু তোমার হাতে। তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে ভালোবাসা দাও।

আমি ভালবাসি তাহমিনা।

চল আমরা চলে যাই।

কোথায়?

যেখানে খুশি। ঢাকায়।

তাহমিনা!

আমাকে তুমি নিয়ে যাও। না কোরো না। তোমাকে পেয়ে আমি বাঁচতে চাই।

ফারুক এতদূর ভাবে নি। তাহমিনা যে তার সাথে যেতে চাইবে, তা সে ভাবতেও পারেনি। কিন্তু তাহলেও সে ফিরতে পারত না। এখন ফেরবার আর পথ নেই। একেলা সে ফিরে যেতে পারবে না। আর কী করেই বা যাবে? তাহমিনার কষ্ট হোক, তাহমিনা তিলে তিলে মরে যাক, সে সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া যদি কিছু হয়? তাহলে?

আর তাহমিনা শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছুই ভাবতে পারল না। এমন জীবন সে চায়নি। আবিদের কথা একবারও তার মনে হোলো না। যেন কোন দিন তাকে সে চিনতো না। ফারুক কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। সে দেবে না। সে তার ভয় ছিনিয়ে নেবে।

দূরে কারা হেঁটে গেল। তাদের স্বর শোনা গেল। হয়ত হাট থেকে ফিরছে মানুষেরা। ফারুক ভাবলো, না সে তাকে ফেলে যাবে না এই দেয়ালের দেশে। কিন্তু কী করে ফিরে যাবে ঢাকায়? তার মা, মা রয়েছেন। কোথায় উঠবে তার? মালেকাবাণু, জাকি, লাবলু, ওদের কথা না হয় ছেড়ে দিল। তার নিজের মাকে সে গিয়ে কি বলবে? ফারুক আস্তে আস্তে বলল, আবিদ আবিদ যদি কিছু করে।

তাহমিনা উত্তরে বলল, তুমি পাগল। আবিদকে আমি চিনি।

ঢাকায় কোথায় উঠবো আমরা?

এতবড় শহরে এতটুকু জায়গা হবে না? হবে চল ফারুক, আর দেরি করো না। তাহলে কোনদিনই আর হবে না। তারপর একটু থেমে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, কাল সকালেই আমরা যাব।

কাল?

হা কাল।

নিস্তব্ধতা।

আমাকে সাহস দাও ফারুক।

ফারুক ওর শুভ্র কপোলে সংক্ষিপ্ত ঠোঁট ছুঁইয়ে গাঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ আমরা কালই যাবো।

.

বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল আফিয়া। খোকা একদৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল, এসেছে আম্মা।

ধরে আনলি, না? তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বলল, না ডাকলে আসতে নেই বুঝি? এদিক দিয়েই তো যাচ্ছিলে।

আসব না কেন? আসতুম। জানেন খোকা আমাকে গিয়ে এই এই বলে ডাকছিল।

খোকা লজ্জায় পালিয়ে গেল। আফিয়া সেদিকে তাকিয়ে বলল, দুষ্ট। তারপর ফারুকের দিকে তাকিয়ে, বেড়াতে বেরিয়েছিলো বুঝি?

জি। আপনাদের এদিককার হাট দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পা রাজি হোলো না খানিক দূর গিয়ে।

তাই বুঝি ফিরে যাচ্ছিলেন? শহুরে মানুষের কিন্তু ওই এক দোষ, হাঁটতে পারে না। ওমা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে আসুন।

ফারুক ভেতরে যেতে যেতে বলল, এ অনুযোগ আপনার মিথ্যে। আমি না হয় শহুরে মানুষ, আপনারা তো নন। ওরো তো একই অবস্থা।

দ্যাখ দিকি, মেয়ে মানুষ কি হেঁটে অভ্যেস?

ফারুক আর আফিয়া এবার হেসে উঠলো। তারপর হঠাৎ আফিয়া উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, যাই একটু চা বলে আসিগে।

উঁহু। ফারুক বলল, খেয়ে এসেছি।

তাহমিনাও কি তাই বলবে নাকি?

আপনি শুধু শুধু কষ্ট করছেন।

ভারী তো কষ্ট। দরদ থাকে কষ্টের ভাগ নাও না?

আফিয়া বলতে বলতে হেসে ফেললেন। হাসতে গিয়ে গালে টোল পড়ল। তাহমিনাও হেসে বলল, অত দরদ আমার নেই। যান, চট করে আসুন।

ফারুক বলল, অবাক হই, এই পাড়াগাঁয়ে জঙ্গলের ভিতরে এত চার জোগাড় কী করে করেন। আশ্চর্য কিন্তু।

আশ্চর্য আবার কী! আর এটা বুঝি বুনো পাড়াগা?

তাছাড়া কী?

বেশ, বেশ। ঢাকায় আছে নাকি আপনাদের তাহমিনাদের মত বাংলো। মেলাই তো সব দালান কোঠা শুনি!

তা নেই।

তবে?

তাহমিনা আফিয়া যখন যাচ্ছিল তখন বলল, খোকাকে নিয়ে আসবেন ধরে। ডেকে এনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এমন দুষ্ট ছেলে।

একটু পরেই ফিরে এলো আফিয়া। সারা মুখে গৃহিনী সুলভ একটা তৃপ্তির ছায়া ছড়ানো। ঘরের কোণ থেকে নিচু টেবিল মাঝখানে সরিয়ে আনতে আনতে বলল, খোকা তোমার এলো না। লজ্জা পেয়েছে।

তাই বুঝি? দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি। কই ও?

ওইতো বাইরে

তাহমিনা বেরিয়ে গেল। ফারুক তাকিয়ে রইলো চলে যাওয়া তার দিকে। একটুখন পরে খোকাকে প্রায় কোলে করে ফিরে এলো সে। বলল, কই কেমন লজ্জা করছে দেখি। কিরে? আপা বলবিনে।

খোকা মুখ ফিরিয়ে নিল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প করল ওরা এটা সেটা। আফিয়া অনুযোগ করল, আর একটু পুডিং নিক না ফারুক। তাকে নিতেই হলো। তাহমিনা প্রায় কিছুই নিল না। শুধু চা। পুডিং সবটা দিল খোকাকে।

একসময়ে আফিয়া তাহমিনাকে শুধালেন, সদর থেকে আর কোন খবর পেলে ওর?

তাহমিনা একমুহূর্ত নীরব থাকল। তারপর হাত থেকে পেয়ালা নামিয়ে বলল, পেয়েছি।

কেমন আছে এখন?

আফিয়ার উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, ভালোই! কাল সকালে আমাকে যেতে হবে।

আফিয়া কিছুই বলল না, শুধু সেই উদ্বিগ্নতা আঁকা রইল সারামুখে। আর ফারুকের হৃদস্পন্দন যেন হঠাৎ থেমে আবার শুরু হলো। মনে পড়ল একটু আগে তাদের দুজনার কথা, কাল তারা পালিয়ে যাবে সেই কথা। তাহমিনা মিছে কথা বলল, কিন্তু স্বর তার কাপল না এতটুকুও। এত তাড়াতাড়ি এত সহজে অমন সোজা একটা পথ যে বেরিয়ে যাবে তা ওর ধারণাতীত। কাল সকালেই যে কী করে ওরা বেরুবে, সেটাই ওর একটু আগে ছিল ভাবনা। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আফিয়া শুধালো, কাল সকালেই যাচ্ছো?

হ্যাঁ।

আর উনি?

ফারুকের দিকে চকিত চোখ তুলে আফিয়া শুধালো, ও-ও আমার সংগে যাচ্ছে। ঢাকা যাবে।

তাই নাকি? এদিকে আমি কিছুই জানিনে। শুনেছিলুম, কিছু দিন নাকি থাকবেন।

না, কালকেই যাচ্ছেন।

ফারুককে শুধালো, তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। আবার এসে কিছুদিন থেকে যাবো।

আফিয়া সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। একটু আগেই হেসে হেসে কথা বলছিল, এখন মন তার ভারী হয়ে এলো। তিনজনেই চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। এমন কি খোকাও। তারপর তাহমিনা বলল, এবারে যেয়ে ফিরতে দেরি হবে ভাবী। ওকে হয়ত সাথে নিয়েই ফিরব তাই।

ও।

তাহমিনা আঁচল থেকে ছোট্ট একটা চাবির ছড়া খুলল। বলল, এটা আপনার কাছে রইল। খোকার বাবা কাল পরশু ফিরতে পারেন। হয়ত কাগজপত্রের ঘর খুলতে হবে।

তাই বলে—-

আপনার কাছেই থাক। আর কাব কাছে দিয়ে যাব? যদি একদিন দেরি হয় তখন? সে ভয়ানক অসুবিধে হবে। তারচে থাক।

আফিয়া চাবির ছড়াটা হাতে নিলেন। বলল, কেন জানি, মন কেমন করছে আমার। ভালোয় ভালোয় ওকে নিয়ে ফিরে এসো।

তাহমিনা বলল, আবদুল এসে আপনার এখানে থাকুক উনি না আসা অবধি। বাংলোয় আরো সকলে থাকবে, কিছু হবে না। আমি আসি তাহলে ভাবী।

তাহমিনা উঠে দাঁড়ালো। ফারুকও। বিদায় নিল সে আফিয়ার কাছ থেকে। আফিয়া আবার তাকে আসতে বলল। তাহমিনা বেরিয়ে এসে খোকার পাশে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, কিরে আপা বললিনে? একবার বলত আপা।

একটু পরে খোকা তার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, আপা। সাথে সাথে তাহমিনা ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আদর চুমু দিল। তারপর বেরিয়ে এলো।

পথে এসে অনেকক্ষণ পরে যখন আশরাফদের কুঠি আর দেখা গেল না তখন তাহমিনা বলল, শেষ সম্পর্ক চুকিয়ে এলাম।

তালা লাগাবে কী করে?

সব টিপ-তালা। বাংলোর চাবি আবদুলের কাছেই থাকবে। বড় বিশ্বাসী লোক। ফারুক একটু পর শুধালো, সেফড্রয়ার, আয়রন চেস্টের চাবি?

সেগুলো কি নিয়ে যাবো ভেবেছ? তাহমিনা উত্তর করল, তোষকের তলায় রেখে গেলেই ও পাবে।

.

সেদিন সারারাত দুজনের কারুরই ঘুম এলো না চোখে! শুধু অরণ্যের বিচিত্র শব্দ আর স্রোত বয়ে যাওয়ার একটানা ধ্বনি। আকাশ পাতাল ভাবল দুজনে দুকামরায় শুয়ে থেকে এপাশ ওপাশ করে। তাহমিনা আবদুলকে সন্ধ্যেয় ইয়াসিন মাঝিকে খবর দিয়ে রাখতে বলেছে। সকালে সে যেন আসে। ফারুক গুছিয়ে রেখেছে তার জিনিসপত্র। অনেকরাত অবধি বাতি জ্বলেছে তাহমিনার ঘরে। মাঝখানে ঘরে রাখা কাঁচের কুঁজো থেকে দুবার পানি গড়িয়ে খেয়েছে ফারুক। তারপর আবার শুতে গেছে বাতি ছোট করে। কিন্তু ঘুম

আসে নি। কারা যেন কী ষড়যন্ত্র করছে কোথায়, ফিসফিস করে কথা কইছে–ফারুকের মনে হতে লাগল রাত্রির মিলিত ধ্বনি এমনি রহস্যময়। কান পেতে সে শুনেছে কেবলি।

অবশেষে একসময়ে কিছুই যখন তার ভালো লাগল না, যখন শুধু ইচ্ছেটুকু রইলো তখন সে আস্তে আস্তে উঠে এলো। তারপর তাহমিনার উষ্ণতাকে নরোম বলের মত বুকে তুলে ঘুমিয়ে পড়ল ফারুক।

.

ঘুম যখন ভাঙলো তখন ভোর রাত। আকাশে শেষ রাতের শেষ তারা। পুব আকাশে কালচে লাল প্রহর। ইয়াসিন এলো। আবদুল উঠল একটু পরেই। বেশি কিছু কথা বললো না কেউই। তালা লাগিয়ে তাহমিনা মুখ ফিরিয়ে বলল, সাবধানে থাকিস আবদুল? রাতে খোকাদের ওখানে থাকবি।

আচ্ছা। কবে ফিরবেন?

কয়েকদিন পরে।

বলতে গিয়ে কেমন গলা কেঁপে উঠল তার। তাড়াতাড়ি সে বাড়ালো। বলল, ওগুলো হাতে নে আবদুল, ওরা যাক। তারপর ফারুকের দিকে ফিরে বলল, চল।

১৩. এ কাহিনীর শেষ এখানেই নয়

কিন্তু এ কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। তেঁতুলিয়ার শাখা নদীর উজানে ইয়াসিন মাঝির নৌকোয় পলাতক দুজনকে যাত্রা করিয়ে হয়ত এ কাহিনীর সমাপ্তি টানা যেত কিন্তু দেড় বছর পরের আর একটি কথা যদি না লিখি তাহলে গোটা কথাই থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। এর প্রস্তুতি হিসেবে গোটা কয়েক ছোট ঘটনা বলা দরকার।

ছনম্বর প্লট থেকে আশরাফের কাজ শেষ হলো দিন পাঁচেক পরে। সদরে সামান্য কাজ আছে, তাছাড়া আবিদকে একবার তার দেখে আসা দরকার।

নৌকোঘাটায় বোট বাঁধল গফুর। আশরাফ নেমে এলো। হাসপাতালে ঢুকতেই বারান্দায় দেখা আবিদের সাথে। একটা লাঠি ভর করে রেলিংয়ের কাছে সে দাঁড়িয়েছিল। আশরাফ এগিয়ে এসে শুধালো, কেমন আছ এখন? বেরিয়েছ দেখছি।

আবিদ ম্লান হেসে উত্তর করল, হ্যাঁ। ভালো, অনেকটা ভালো। স্টিক ভর করে চলতে পারছি কাল থেকে।

আর কদ্দিন লাগবে?

প্রায় তো ভাল হয়েই এলুম। তবে ডান পা বোধ হয় দুর্বল থেকেই যাবে। স্টিক ছাড়া হাঁটতে পারব বলে আর মনে হচ্ছে না।

তবু ভালো।

তারপর ওর কাঁধে স্নেহের ভঙ্গিতে হাত রেখে বলল একটু পরে, কী বলছ তুমি। কিছুদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আবিদ একহাতে ওকে ধরে বেডের দিকে এগুতে এগুতে বলল, দাঁতটা বসিয়ে ছিল জোর। এমন কোনদিন আর হয়নি। ভাবলে এখনো মনে হয় বুঝি রক্তপাত হবে। কদিন এত যন্ত্রণা ছিল যে শুধু ভেবেছি, আবদুল যখন গুলি করল তখন কুমিরের গায়ে না লেগে আমাকে বিধলে ভালো হোতো।

থাক ওসব কথা। বেশি কথা বোলো না।

আবিদ বেডে এসে শুয়ে পড়ল। পাজামা তুলে পাটা দেখাল একবার। তারপর চুপ করে পড়ে রইল। সারা কামরায় শুধু শুভ্রতা। আর ওষুধের একটা ঝাঁঝালো মিশেল গন্ধ। ধবধবে পর্দা টাঙানো দরোজায়, জানালায়। বেডের পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিতে কয়েকটি ফুল। আজ সকালেই বদলানো হয়েছে। আবিদ একটা ফুল তর্জনী আর মধ্যমার ভেতরে রেখে দোলাতে দোলাতে শুধালো. সোজা সদরেই এলেন?

না, দিন পাঁচেক আগে বেরিয়েছি। গিছলাম ছম্বর প্লটে। কয়েকটা বড় অর্ডার ছিল, সে ব্যাপারে দেখাশোনা করতে। সেখান থেকেই সোজা ফিরছি।

কোন ফার্ম থেকে?

চাটগাঁর সেই বড় পার্টি।

আবিদ একটুকাল ভ্রু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করল তারপর বলল, ও।

আশরাফ চাদরের একটা ভাঁজ নখ দিয়ে মিলিয়ে দিতে দিতে বলল, তাহলে ভালোই আছো এখন। তাহমিনা আর আসে নি?

না।

ও।

কেমন আছে ওরা?

ভালো সবাই।

আবিদ তাহমিনার মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। এ কদিন কি করেছে ও? তারপর আর একবারও এলো না সে আবিদ ভাবল। আবিদ এত অপেক্ষা করেছে তার জন্যে।

আশরাফ বলল, তাহলে আজকেই তোমাকে নিয়ে যাই।

আমিও তাই ভাবছি।

আশরাফ বুঝল আবিদ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভালো লাগছে না তার হাসপাতালে। তাই আর সে কোনো কথা না বলে ঐ কথা বলল। তারপর উঠে গেল সার্জেনের কামরায়। একবার ভেবেছিল ফারুকের কথা বলে আবিদকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভেবেছে, এখন বেশি বকানো ভালো হবে না। তাই আর কিছুই বলেনি।

সার্জন যা বললো, এক কথায় তার মানে দাঁড়ায় এই যে, এখন অবশ্যি আর কোন ভয় নেই, ঘা প্রায় শুকিয়ে আসবার পথে, তবে শরীর বড় দুর্বল। আর কিছুদিন রাখতে পারলে ভালো, তবে নিয়ে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না—- প্রেসক্রিপসন ফলো করলেই চলবে। তিনি সময় পেলে মাঝখানে নিজে একবার গিয়ে দেখে আসবেন। আশরাফ ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলে গেল, বাইরে কাজ সেরে আজ বিকেলেই ওকে নিয়ে যাবে।

.

নৌকোঘাটায় আবিদ স্টিকে ভর করে আস্তে আস্তে নেমে এলো আশরাফের সাথে। অ্যাশ শেড উলেন ট্রাউজার পরনে। আর মেরুন রঙের শার্ট। ক্রোম মেটালিক স্টিক হাতে।

আগের মতই দীর্ঘ, সবল, আর উদ্ধত। দেখে চট করে বোঝা যায় না যে এতবড় একটা বিপর্যয় তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে বলল, গফুর, আমি একটু শোবো।

.

ঘাটে এসে যখন নৌকা ভিড়ল তখন প্রায় সন্ধ্যে। এখন শুধু স্টিকে ভর করে আবিদ হাঁটতে পারল না, আশরাফের কাঁধে সে হাত রেখে ভর করল। যেতে যেতে জিগ্যেস করল, আলো দেখছিনে বাংলায়? এখনো জ্বালে নি নাকি?

জ্বলবে হয়ত।

এতক্ষণে তো পেট্রোম্যাক্স জ্বলার কথা।

হ্যাঁ। তোমার অসুবিধা হচ্ছে নাতো?

না। একটু।

বাংলোর কাছে এসে অবাক হলো আশরাফ। সারাটা বাংলো ঘিরে এক অশুভ নির্জনতা। আলো নেই। কেউ নেই। কেমন থোকা থোকা অন্ধকার ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। সে বলল, গফুর টর্চটা তুই ধর। আমি ওকে নিয়ে ওঠছি।

গফুর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল টর্চ নিয়ে। জ্বালালো। আশরাফ আর আবিদ উঠে এলো। বারান্দায়। আবিদ বলল, কারো সাড়া পাচ্ছিনে, কি ব্যাপার?

কী জানি। আমার ওখানে যায়নি তো!

ভেতরের বারান্দা ঘুরে যেতে সে আবদুলের নাম ধরে দুবার ডাকল।

আবদুল হারিকেন হাতে প্রায় ছুটে এলো। হুজুর এসেছেন?

আশরাফ শুধালো, মেমসায়েব কই? উনি কই?

তিনি তো আজ তিনদিন হলো সদরে গেছেন!

আর প্রায় সাথে সাথে আবিদ উত্তেজিত স্বরে জিগ্যেস করল, কে? উনি কে?

সাথে সাথে প্রলয় ঘটে গেল যেন। আবদুল একে একে বলে গেল সব কথা। ফারুকের আসবার কথা থেকে তাহমিনা আর তার ভোরে চলে যাবার দিন অবধি। আশরাফ হতভম্ব হয়ে গেল। আবিদ স্তম্ভিত হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। এক মুহূর্তের জন্য কিছুই সে ভাবতে পারল না। কিছুই করতে পারল না। কেবল একটা অদ্ভুত বিস্মৃতি এসে তাকে আচ্ছন্ন, অবশ করে ফেলল যেন। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে ভালো করে তার মুখ দেখা গেল না। সে আশরাফের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, কেন

আপনি চলে গেলেন এখান থেকে? কি হত আমার অমন দুদশটা অর্ডার নষ্ট হলে? আমাকে কেন জানালেন না ফারুকের কথা? কী ভরসায় রেখে গেলেন সব একলা ফেলে? কেন? কেন?

আবিদ তুমি থামো।

ততক্ষণে আবিদ তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তাহমিনা নেই। আবদুল, তুই যেতে দিলি কেন?

হুজুর।

আবিদ, থামো। অসুখ বেড়ে যাবে তোমার। আমি দেখছি সব।

আর কী দেখবেন আপনি?

বলতে বলতে আস্তে আস্তে থেমে গেল আবিদ। যেন আর কিছু তার বলবার নেই। সে কী যেন বুঝতে পারল। ঠোঁট কাপল কিছু বলবার জন্য, কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। আশরাফের দিকে, আবদুলের দিকে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

আবদুল শোবার ঘরের তালা ভেঙে ফেলল একটু পরেই। জ্বালল পেট্রোম্যাক্স। আশরাফ দুজন খানসামাকে ডেকে আফিয়াকে নিয়ে আসতে পাঠালো। সাথে গেল গফুর। আরো বলে দিল, খোকাকেও যেন নিয়ে আসে। আজ রাতে এখানেই হয়ত থাকতে হবে। আশরাফের সমস্ত ব্যাপারটা লাগছিল দুঃস্বপ্নের মত। তাহমিনার ওপর ভীষণ রাগ হলো তার। সমস্ত স্নেহ আর মমতা নিমেষে মুছে গেল তার ওপর থেকে। কেন সে এমন করল? কেন সে ফারুকের সাথে পালিয়ে গেল? কিসের অভাব ছিল তার? নিজে দেখে তাহমিনার সাথে বিয়ে ঠিক করেছিল সে, তাই নিজেকে আজ বড়ো অপরাধী বলে মনে হলো তার। পর মুহূর্তে ভাবল, এমন তো নাও হতে পারে। কিন্তু সে দুরাশা শুধু মুহূর্তের জন্য। এ হচ্ছে এমন কিছু যা দুরাশারও অতীত।

আবদুল শোবার ঘরে নিয়ে গেল পেট্রোম্যাকস। আবিদ আর আশরাফ ঢুকলো তার পেছনে পেছনে। আবিদ প্রথমত ভয়ে তারপর যেন ঘৃণায় ভালো করে তাকাল না কোনদিকে, কী জানি কি চোখে পড়ে যায়। চুপ করে সে ঠায় বসে রইল। তারপর এক সময়ে তার বিস্ফারিত চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগল তার অজান্তে মরার সর্বত্র। খাটের বালিশে এখনো মাথা রাখবার গভী: ভাঁজ। চাদরটা এলেমেলো হয়ে পড়ে আছে। তাহমিনা ভোরে উঠে যেমন রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি। আলনায় এখনো তার তাল পাকানো ছেড়ে রাখা কয়েকটা শাড়ি লুটিয়ে পড়ে আছে। আর কয়েকটা ধোয়া শাড়ি, চোলি আর ব্রা। এখনো ভাঁজ ভাঙা হয়নি তার। তাহমিনা পরেনি। নিচে কয়েক জোড়া স্যাণ্ডেল আর চটি— তাহমিনার পায়ের ভারে কোনটায় আঙ্গুলের আবছা দাগ পড়েছে আবিদ তা জানে। আজ হঠাৎ তার মনে হলো কখন সে সব কিছুই জেনে ফেলেছে গাঁথা হয়ে রয়েছে তার মনে। আলমিরায় থরে থরে সাজানো তার কাপড়। কোনটায় তাকে

মানাতো এখন স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ল। আর মনে পড়ল ভীষণ লাল সেই চোলির কথা—- আঁটসাঁট বাঁধা পড়ত যাতে তার সুগৌর সুন্দর স্বাস্থ্য। সবচে মানাত তাকে ওই চোলিতে। সেটা বুঝি আলমিরাতেই রাখা। যে সোফায় সে বসে রয়েছে সেখানে হয়ত শেষবার বসেছিল তাহমিনা। ছোট্ট টেবিলের ওপর তাহমিনার ফটো কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার পাশে নিভিয়ে রাখা, কিছুটা ধোঁয়ায় ম্লান হয়ে যাওয়া বেডল্যাম্প। আর বাতাসে যেন তাহমিনার গাত্রসৌরভ মিহি প্রসাধনের ভারী ঘ্রাণ। সমস্ত ঘরে প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে তার স্পর্শ। শুধু সে নেই। অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো তার। মনে হলো এখুনি সে ফিরবে। তাহমিনার চিবুকের আঁটি পর্যন্ত তার মনে আছে। আর ওই জানালায় তাহমিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখত। টুকরো টুকরো ছবির মত সমস্ত চিত্র এসে উঘাটিত হলো তার সমুখে। মিলিয়ে গেল। আর চারদিকে তাহমিনার স্পর্শ এত গাঢ় যে বুঝি হাত দিয়ে ধরা যায়। আবিদের এখন ইচ্ছে হলা হো হো করে উচ্চস্বরে হেসে উঠে বিকট বিভৎস একটা হাসিতে সব কিছু ডুবিয়ে দিতে। কিন্তু তার ভয় হলো। মনে হোলো সমস্ত শক্তি যেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে। তার সাহস হারিয়ে গেছে।

তোষকের নিচে পেল চাবি আর একটা চিঠি। তাহমিনার চিঠি। আশরাফ দুর্বল হাতে ভাঁজ খুলে পড়ল; তাহমিনার সুন্দর হাতের অক্ষরে গোটা গোটা করে লেখা, "আবিদ, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। যদি পারো আমাকে ভুলে যেও। ইতি, তোমার তাহমিনা" কোন তারিখ নেই। আর কিছু লেখা নেই। কাগজের উল্টোপিঠ শাদা।

চাবি হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চিঠিটা এগিয়ে দিল আবিদের সামনে। ঘরের ভেতরে জ্বলছে উজ্জ্বল শুভ্র আলো। আবিদ চিঠিটা মেলে ধরল। কিন্তু কিছুই বুঝতে

পারল না সে। সমস্ত কিছু যেন এক দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা রয়েছে, কিছুতেই তার অর্থ উদ্ধার করা যাবে না।

এমন সময়ে বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠলো। আবিদ উৎকর্ণ হয়ে তাকাল। আশরাফ বলল, আফিয়াকে নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলাম। বোধ হয় এলো। আবদুল কফি আছে?

আছে হুজুর।

এক কাপ কফি কর আবিদের জন্যে।

আবিদ প্রতিবাদ করল। উত্তরে আশরাফ বলল, তোমার দুর্বলতা কেটে যাবে।

আফিয়ার কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া গেল। আশরাফ খাটের ওপর বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল। আবিদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আফিয়া চাবি খুলে দিল আঁচল থেকে, কান্নাধরা গলায় বলল, যাবার সময় দিয়ে গিছল রাক্ষসী।

আর কোন কথা বললো না কেউই। যেন পাথরের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। সবাই ভাবছে গভীর মাথা ঝুঁকিয়ে। আবদুল কফি করে নিয়ে এলো।

বাইরে এসে আশরাফ আফিয়াকে বলল, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারনি?

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তাহমিনা যে এমন করে চলে যাবে, কেলেঙ্কারী করবে, তা কে জানতো?

আশ্চর্য।

আমার মন কেমন করছে।

আজ রাতে এখানেই থাকো। আবিদের এমন দুর্বল শরীর কখন কী হয়, কী করে বসে, কে জানে?

সেই ভালো।

তুমি ওকে একটু বোঝাও। নইলে ও সইতে পারবে না।

আফিয়া বিছানা পেতে দিল আবিদের। ছেলেমানুষের মত ধরে শুইয়ে দিল। আবিদ যেন বোবা হয়ে গেছে! আর কোন কথা বলে নি তারপর থেকে। একবার শুধু আফিয়ার হাত ধরে বলেছে, ভাবী, তাহমিনা কিছুই বলে যায় নি?

আফিয়া মুখ ফেরাল চাপা কান্নায়। আবিদ বালিশে মুখ ফিরিয়ে আপন মনেই যেন আরেকবার বলল, তাহমিনা চলে গেছে ভাবী!

আফিয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এখানেই থাকো। আমি ও ঘরে খোকাকে নিয়ে আছি।

অনেকক্ষণ পর আবিদ পাশ ফিরে দেখল আশরাফ পাশে বসে আছে।

আপনি যান নি?

তুমি ঘুমোও।

হ্যাঁ, আমি ঘুমোবো।

তোমার খারাপ লাগছে খুব?

না।

তুমি ঘুমোও তারপর আমি যাবো।

আবিদ কষ্টের একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করল। আশরাফ একটু এগিয়ে এলো, ব্যথা করছে?

না, এমনি।

আশরাফ বুঝল। একটু পর সে স্নেহের সুরে বলল, তুমি ভেবো না, ও ফিরে আসবেই।

আর সে আসবে না।

তাহমিনা না এসে পারে না। আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো। এখনো ও ছেলেমানুষ। তুমি ভেবো না। তুমি ঘুমাও।

আপনি জানেন না। আমি জানি, ও আর ফিরবে না।

তুমি ঘুমোও।

আবিদ পাশ ফিরে শুলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। তখন সে দরোজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। অনেক রাতে আবিদের মনে হলো তাহমিনা যেন পাশে শুয়ে। সে চমকে উঠে দেখল, ভুল। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। ব্যর্থ পৌরুষত্বের প্রতি ধিক্কার এলো। ঘুম তার এলো না। তাহমিনা নেই, সে ভাবতে পারল না। বিরাট শূন্যতা যেন আজ তার চারদিকে। তাকে যেন গ্রাস করে ফেলবে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আবিদ। পেট্রোম্যাক্স তখনো জ্বলছে, কেউ নিভিয়ে দিয়ে যায়নি। আবিদ কাপড় রাখা আলমিরার কাছে, আলনার পাশে, গিয়ে দাঁড়িয়ে স্পর্শ বুলোলো তাহমিনার শাড়ির ওপরে। অনেকক্ষণ ধরে। তাল পাকানো ছেড়ে রাখা শাড়িটাকে তুলল কিছুটা মুঠোর ভেতরে। নিল তার আশ্চর্য ঘ্রাণ অনেকক্ষণ ধরে।

তাহমিনা যে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াত, তারপর সেখানে এসে দাঁড়াল। স্পর্শ করল তার সূক্ষ্ম ঝালর দেয়া পর্দা। আবিদ প্রেতাত্মার মত সমস্তটা কামরায় বিস্ফারিত চোখে কম্পিত হৃদয়ে জেগে রইল।

সে রাতে নাও বাইতে গিয়ে দুএকজন দেখেছে আবিদের নিশুতি বাংলোর শার্সীতে অনেক। রাত অবধি উজ্জ্বল আলো থামের মত নেমে এসে বাইরের মাটি স্পর্শ করে আছে।

.

এরপর থেকে আবিদ শান্ত হয়ে গেছে অসম্ভব রকমে। আর কোনোদিন সে শিকারে বেরোয়নি। সব সময়ে সারামুখে কেমন একটা স্তব্ধতা, ক্লান্তির ছায়া ছড়ানো। কথা বলে খুব কম। ব্যবসার কাজে প্রায় বেরোয় না বললেই চলে। আশরাফ নিজেই এখন সব দেখে। আর মাঝে মাঝেই অনুযোগ করে, তুমি এমন করে থাকলে, শরীর যে টিকবে না।

আবিদ উত্তরে হাসে। ম্লান হাসে। এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দেয় না।

কোনো কোনো সকালে তাকে দেখা যায় দীর্ঘ দুপুর অবধি বারান্দায় ডেক চেয়ার পেতে বসে থাকতে দূর অরণ্যের দিকে। দিনের খবরের কাগজ পাশেই পড়ে থাকে, পড়ে না। কিংবা হয়ত বিকেলে বসে চেক-বোর্ড নিয়ে। একেলাই খেলে। অনেক রাত হয়ে যায়

তবুও ওঠে না। মাঝে মাঝে অনেক রাত্তিরে তাকে দেখা যায় ডান পা একটু টেনে টেনে বেডল্যাম্প হাতে বাংলোর প্রত্যেকটি কামরা ঘুরে বেড়াতে।

কয়েকদিন একেলা বেরোয় সমুখের পথ দিয়ে। অনেকদূর অবধি চলে যায়। আফিয়া তার জানালা দিয়ে দেখে, কিন্তু ডেকে বসাতে সাহস পায় না। মনে হয় মানুষটা যেন কাঁচের তৈরি, সামান্য স্পর্শেই চুর চুর হয়ে যাবে। কোনো কোনোদিন আফিয়া আসে বাংলোয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তত্ত্ব নেয় আবিদের। আবদুল আর খানসামাদের মৃদু তিরস্কার করে কোনো ভুলের জন্য। বারবার করে বলে যায় ভালো করে লক্ষ্য রাখবার জন্য। দাঁড়িয়ে থেকে ঘর গুছিয়ে দিয়ে যায়। বদলে দিয়ে যায় ফুলদানির ফুল।

কিন্তু তবু বাসি ফুলের মত হয়ে থাকে যেন সারাটা আবহ। আফিয়ার দুঃখ হয়, রাগ হয়। স্বামীকে সে তিরস্কার করে, তাহমিনার খোঁজ না নেয়ার জন্যে। উত্তরে আশরাফ বলে, আবিদ তাকে কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। আফিয়া বলে, তাই বলে কি সে চুপ করে থাকবে নাকি? একটা কিছু করা দরকার।

আশরাফ একদিন এসে আবিদকে বলল, কাল আমি ঢাকা যাচ্ছি।

কেন?

এমন করে আর কদ্দিন চলবে?

আবিদ তার হাত ধরে বাধা দেয়, না, দরকার নেই। তাহমিনা সুখে থাক, তাকে ফিরিয়ে আনবেন না।

এ তোমার পাগলামো। কোন মানে হয় না এর।

তাহমিনা আসবে না।

তাই বলে চুপ করে বসে থাকবে নাকি? আমি কালই যাচ্ছি।

আশরাফ আজ ঠিক করেই এসেছিল যে আবিদকে সে রাজি করাবেই। একটা কোন খবর নেয়া হবে না, এ কী রকম কথা?

অবশেষে আবিদ একে একে তাকে বলল সব কথা। বিয়ের বছর খানেক পর থেকে শুরু সেই সন্দেহের কথা। ডাক্তারের রিপোর্টের কথা। সবকিছু। এই প্রথম সে জানালো আশরাফকে। বলল, তাহমিনা ঠিকই করেছে। আমার কাছে থেকে কী সে পেত? আমি ওকে কী দিতে পারি যে ওকে ফিরিয়ে আনতে যাব? আমার কি আছে, ওকে ফিরিয়ে আনি?

একথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?

তাতেও কিছু হতো না।

তবুও।

সারবার কোনো আশাই ছিল না।

তুমি নিজেও বুঝতে পারনি বিয়ের আগে?

না।

আশরাফ চুপ করে রইল। তার বলবার আর কিছু নেই। নতুন করে অর্থময় হয়ে উঠলো তাহমিনার প্রতিটি আচরণ। স্পষ্ট হলো তাহমিনার আর ফারুকের ঘনিষ্ঠতার কারণ। তার মনে হলো, তার মুঠো আলগা হয়ে গেছে। ঝুর ঝুর করে ফ্রেম ধ্বসে ভেঙে পড়ছে। আবিদ বলল, একটা কথা আমার রাখবেন?

কী?

আমি যেমন আছি, তেমনি থাকতে চাই। তাহমিনাকে কোনোদিন আপনি ফেরাবেন না। যাবেন না। আমি মনে করবো, তাহমিনা মরে গেছে।

১৪. বাসা নিয়েছে ফারুক

বাসা নিয়েছে ফারুক। মাকে সে জানায়নি, ব্যথা পাবেন। ভেবেছে, কিছুদিন পর আস্তে আস্তে সব কিছু জানাবে তাকে, বুঝিয়ে বলবে। আপাতত বলে এসেছে যে, নতুন কাজ পেয়েছে, বাইরে বাইরে থাকতে হবে। তাহমিন, ফারুক যখন মায়ের কাছে, এক রেস্তোরাঁয়। বসে ছিল। ফারুক যখন ফিরে এলো, তখন। উজ্জ্বল চোখ মেলে শুধালো, কি হলো?

মাকে বলে এলাম তাই।

অমন না বলে খোলাখুলি বললেই পারতে। আমি তো নিজেই যেতে চেয়েছিলাম, তুমি মানা করলে। মাকে আমি পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলতাম। আমাকে তিনি ঠেলে দিতে পারতেন না। তবু চট করে না বলাই ভালো। কিছুদিন যাৎ, মা দেশে যাবেন বলছিলেন, অনেক দিন যান–বেশ কিছুদিন থাকবেন, ফিরে আসুন, তখন দুজনেই যাব।

আর কী বললেন?

কিছু না।

এমনি করে ধীরে ধীরে সব কিছু গুছিয়ে এনেছে তারা। তাহমিনা সাজিয়েছে তার ছোট্ট সংসার। ফারুক সেই খবরের কাগজেই আছে। তাহমিনা দুটো টিউশানি নিয়েছে।

ফারুক বাধা দিয়েছে তাকে, তুমি কী বলো তো? তোমার আবার টিউশানি করবার কী দরকার ছিল?

কেন বসেই তো আছি। তবু দুবেলা কিছু কাজ জুটলো। তাছাড়া কটা টাকা এলে তো আর ফেলনা যাবে না। লাগবে।

এতেই তো বেশ চলছিল মিনু।

তুমি থামো তো। ফারুক আর কিছু বলেনি। সকালে একটা টিউশানি, বিকেলে আর একটা। সকাল বেলা তাহমিনা বেরোয় দীর্ঘ দুটি বেণি করে বুকের ওপর ফিরিয়ে একটা সাদাসিদে শাড়ি পরে। যাবার সময় ফারুককে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। তার আগেই সে চা করে রেখেছে। তারপর দুজনে মিলে চায়ে চুমুক দেয়। কত কতদিন ফারুক অমুযোগ করে, এত ভোরে উঠে সে। বেরিয়ে যায় কিছু তার ভালো লাগে না। তাহমিনা হাসে, বলে, পয়সা জিনিসটে যত খারাপই। হোক, আদতে কিন্তু সবচে জরুরি। সেটা ভুললে চলবে কেন? কোন কোনদিন ফারুকের খুনসুটি সহ্য করতে না পেরে আরো কিছুক্ষণ বসতে হয়। দেরি করতে হয়। খাটে পা ঝুলিয়ে তার এই বাড়তি সোহাগ নিতে ভালোই লাগে।

সকালে ঘণ্টা দেড়েক পড়াতে হয়। ক্লাস এইটে পড়ে মেয়েটি তাকে। তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন সে ফেরে তখন বেলা সাড়ে নটা কী দশটা, মুখের স্বল্প প্রসাধন হয় ম্লানতর। একটা তৃপ্তিকর ক্লান্তির ছায়া ছড়িয়ে থাকে সারামুখে। সেই শাড়ি পরেই সংসারের কাজে

হাত দেয়। তারপর দুপুর বেলা দুজনে জানালার ধারে উবু হয়ে শুয়ে বই পড়ে। কিংবা তাহমিনা পড়ে, ফারুক শোনে। এমনি। ঘর গুছোঁয়। টবে ফুলের লালন করে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ও বাড়ির বৌটির সাথে আলাপ করে খুচরো। বিকেলে দুজনে বেরোয় একসাথে। তাহমিনা যাবে টিউশানিতে আর ফারুক তার আপিসে। তাহমিনা এখন গোল করে খোঁপা বাঁধে। সেই চপল বেণি আর নেই। সকালে ছিল আঁটসাঁট, এখন অলস এলিয়ে দেয় শাড়ির ভাঁজ। মুখ সাবানে মেজে শুভ্র করে তোলে। বেরিয়ে হাঁটতে থাকে তারা। নবাবগঞ্জের এদিকে তেমন ভিড় নেই শহরের। কেমন বিরলতার আবহ চারদিকে। বেড়াতে বেড়াতে যখন আকাশ মিহি লাল হয়ে আসে, তখন তারা সেই বাড়ির ফটকের সমুখে যেখানে তাহমিনার বিকেল টুশানি। মেয়েটি ম্যাট্রিক দেবে, পাশ করবে বলে মনে হয় না, তবু চেষ্টা করতে দোষ কী? তাই তাহমিনাকে রাখা। সকালে নাকি আর একজন টিউটর আছেন, তিনি অঙ্ক করান। এখানে সে পড়ায় জিরিয়ে জিরিয়ে। তাড়াহুড়ো করে না।

ফিরে যখন আসে, তখন ঝি রান্নাবান্না শেষ করে রেখেছে। তাকে বিদেয় করে তাহমিনা নিজে খেয়ে নিয়ে বেশ বদলিয়ে যখন স্থির হয় তখন রাত কিছুটা বেড়েছে। ফারুক তখনো আসে নি। সে আসে এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে আপিস থেকে। কোনদিন একটায়। বলে, সারা দুনিয়ার লোকের সকাল বেলার চা উপভোগ করবার বন্দোবস্ত করে এলুম।

কী লিখলে আজকে?

ফারুক প্রত্যুত্তরে সম্পাদকীয়ের শিরোনামটা জানায়। দুএকটা মজার খবরের কথা বলে খেতে খেতে। তাহমিনা শোনে। তারপর হয়ত, আচ্ছা মিনু, ভোর সকালে কাগজ বেরুবার। নিয়ম কে আবিষ্কার করেছিল বলতে পার?

কী জানি।

যেই বের করুক, ভাল করেনি। কী ট্যাজেডি বলোত? শহরে নিশাচর বলতে এক পাহারাওয়ালা আর খবরের কাগজের লোক।

আর চোর বাটপাড়?

তারাও এ দুদলের মধ্যেই পড়ে।

বলেই ফারুক হেসে ওঠে। একটা সিগারেট ধরায় আয়েস করে।

তাহমিনা বলে, এতই যখন তখন খবরের কাগজে কাজ না করলেই পার? অন্য কোথাও দেখ না।

উঁহু। অন্য কাজে পয়সা আছে, তৃপ্তি নেই। তবু তো সারারাত আমায় থাকতে হয় না। তাহলে যে কী করতে!

কিন্তু সবদিন এমন যায় না। কোনোদিন ফারুক ফেরে, একটু অন্যমনা দেখায়। কী যেন ভাবে, কথা বলে না। বললেও ভাল করে বলে না। তার কাছাকাছি সরে এসে খুব কাছে মুখ রেখে তাহমিনা জিগ্যেস করে, কী হয়েছে তোমার?

কই কিছু নাতো।

তাহমিনার বুক কেঁপে ওঠে। সুন্দরবনের দীর্ঘ অরণ্য যেন বুকের ভেতরে মাথা কুটতে থাকে। তবে চুপ করে রয়েছ কেন?

এমনি।

মিছে কথা। ভাবছ তাই না? কী ভাবছ?

ফারুক তার চোখের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলে, আমি ভাবছি নে মিনু।

কিন্তু ফারুকও জানে, তাহমিনাও জানে, এ মিছে কথা! ফারুকের মনে এখন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়। সে আর তাকাতে পারে না তাহমিনার দিকে। তাহমিনা ওর হাত ধরে স্পর্শ থেকে অনুভব করতে পারে তাব মনের কথা। বলে, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

কেন, মিনু?

সত্যি বলো।

এরচেয়ে বেশি কি বলব। তুমি কি জানো না, তোমায় আমি কত ভালোবাসি?

তাহমিনার দুঃখ হয়। খুশি হয় না। ক্ষুণ্ণ হয়। বলে, তাহলে তোমার দ্বিধা কেন?

না, না।

বলে ফারুক দুহাতে ওকে আকর্ষণ করে বুকের উত্তাপে বাধে। তাহমিনা শিথিল স্বরে নিচু পর্দায় উচ্চারণ করে, আমার দিকে তাকাও আমার চোখের দিকে—-আমার জড়িয়ে আসে, কিছুটা অর্থহীন হয়ে আসে তার কথা। কিন্তু বুঝতে পারে ফারুক, কী, ও বলতে চায়। মৃদু গলায় বলে, তুমি আছো, আমি সব ভাবনার ইতি করে দিয়েছি।

তাহমিনা তার সমস্ত শরীর শিথিল করে সাহস সঞ্চারিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে অনেকক্ষণ।

১৫. সেদিন ছিল ছুটি

সেদিন ছিল ছুটি। ফারুককে আপিসে যেতে হবে না। তাহমিনার শুধু সকালের টিউশানি। বিকেলেরটায় ছুটি তারো। দুপুরে তাহমিনা বেরিয়ে গেল একেলা। বলে গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবে। ফারুক সে সময়টা শুধু শুয়ে ঘুমিয়ে কাটালো।

ফিরে যখন এলো তখন ফারুক জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসে বলল, এলে?

হুঁ। কোথায় গিছলাম বলোত?

তুমি না বললে জানব কী করে, বাহ্।

আমিন বাগে।

তোমার মার কাছে? হঠাৎ কী ব্যাপার?

সব সম্পর্ক চুকিয়ে এলাম।

ফারুক ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। কেন যেন ভয় পেল। কেন যেন তাহমিনাকে সে সমর্থন করতে পারল না মনে মনে।

শাড়ির আঁটসাট ভাঁজ শিথিল করে অলস ভঙ্গিতে খোঁপা আলগা করে দিতে দিতে তাহমিনা ছোট্ট হাই তুলে বলল, তোমাকে বলিনি। মা জানতে পেরেছিলেন সব। ভেবেছিলুম জানাবো না। এখনকার জন্যে নয়, বিয়ের ওপরই দুঃখ হোতো তার। সেটাও আমি চাইনে। লাবলু একদিন এসেছিল সন্ধ্যের পর। মা এক পাও নড়তে পারেন না, নইলে দেখতে নিজেই চলে আসতেন। তাছাড়া বোধ হয় আমাকে ঘেন্নাও করেন, নইলে আসতে কি?

লাবলু কী বলেছে? জাকি?

জাকি ভাই অফিসিয়াল কাজে করাচি গিছলেন, আজকেই ফিরেছেন। এখনো আপিসে। দেখো আজকেই না এসে পড়ে এখানে।

কেন?

দেখো, আসবেই। মাকে সব কথা বলেছি, না বলে উপায় ছিল না। তোমাকে বলিনি, তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়বে তাই। কী আশ্চর্য জানো, মা আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। একটুও কাঁদলেন না, কিছু না, শুধু চুপ করে রইলেন।

মা আঘাত পেয়েছেন।

কী জানি। আর বাবা, বাবা আমার নাম অবধি শুনতে চাননি। আমি তার কাছে মরে গেছি। দুঃখ শুধু, কেউ বুঝলো না ফারুক। তারপর একটু পর, একটু থেমে তাহমিনা মাথা ঝাঁকিয়ে সেই আবহ কাটিয়ে দিতে দিতে বলল, মা শুধু বললেন, কবে মরে যাই তার ঠিক নেই, আমাকে ফেলে যাবি?

তাহমিনা উত্তরে কী বলেছে ফারুক তা শুধালো না। তাহমিনাও বলল না। চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ তাহমিনা মাথা ঝাঁকিয়ে সেই আবহ কাটিয়ে দিতে দিতে বলল, চল বেরোই। আজ না সিনেমায় যাব।

তাহমিনা অনুমান করেছিল ঠিকই যে জাকি আজকেই আসবে। এলো তাই। তাহমিনা মালেকাবাণুকে বলেছিল, লাবলুও জানতো, তারা কোথায় বাসা করেছে, সেই নিশানা ধরে। কিন্তু পেল না কাউকে। ঝিকে জিগ্যেস করে জানলো সিনেমায় গেছে। মরিস নিয়ে আবার সে বেরিয়ে গেল। ফিরে যখন এলো তখনো ওরা ফেরেনি। ঝি ওপরের ঘর খুলে দিলে পর সে বসে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তাহমিনা বলল, ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঝিটার আক্কেল দেখো। বাসায় এক দণ্ড না থাকলে এমনি করতে হয়!

কোন দরকারে হয়ত জ্বেলেছে।

www.bengaliebook.com

এমনি কথা বলতে বলতে ওরা ওপরে এসে দোরপর্দা সরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। তাহমিনা চোখ নিচু করল কিছুটা। ফারুক তাকিয়ে রইল সোজাসুজি। জাকি একটা খাড়া পিঠ চেয়ার টেনে বসে আছে। তাহমিনা ঢুকতে ঢুকতে বলল, জানতুম তুমি আসবে। কিন্তু সব কথা আমি মাকে বলে এসেছি।

জাকি একটুকাল নিঃশ্বাস বন্ধ করে থেকে তারপর বলল, আমার সাথেও তোমার কথা হওয়া দরকার। তাই এসেছি।

বেশ। যা বলবে আমাকেই বলবে, ফারুককে কিছু বলতে পারবে না। আমার ওপর তোমার অধিকার আছে মনে করেই এসেছ, কিন্তু ওর ওপর যে নেই এটা মনে রাখলে খুশি হব।

বল।

তাহমিনা খাটের পাশে এসে বসলো। তার কথাগুলো শোনাল দৃঢ় আর অনমনীয়। এমনভাবে শুরু করলো যেন এখুনি সে শেষ করে ফেলতে চায় সব কথা। সময় নষ্ট হতে দিতে চায় না। ফারুক সরে গেল সেখান থেকে।

জাকি নরম সুরেই শুরু করল, তুমি যে এমুন করবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমিও না।

তাহমিনার উত্তর শুনে চমক ভাঙ্গল জাকির। প্রশ্ন করলো, কেন?

নতুন করে বলবার ইচ্ছে নেই, নইলে বলতাম। মার কাছ থেকেই শুনে নিও।

কিছু হলে আমাকে তোমার বলা উচিত।

তোমরা আমার ভালোর জন্যেই সব করেছিলে। সে ভালো সইলো না। তাই নিজের ভালো নিজেই বেছে নিয়েছি।

আমাদের মুখে চুন কালি দিয়ে?

আমি ছোট্ট আর নই, আমি সব বুঝি।

তবুও?

হ্যাঁ।

জাকি থামল। তারপর সুর চড়িয়ে বলল, আবিদ চুপ করে থাকবে না, তা জানো?

তার যা খুশি করতে পারে।

ও।

কিছু করতে হলে সে-ই করবে। তোমাদের করবার কিছু নেই।

হয়ত নেই; আশরাফের চিঠি পাবার পর অন্তত বোন হিসেবে আমার যা করবার আছে তা করতে চেয়েছি। সেটা কি অনুচিত?

না। আমার যা বলবার সব মাকে বলেছি।

শুনেছি।

তারপর না এলেও তোমার চলত। সেই আমার শেষ কথা। তুমি এখন যাও।

এত শীগগীর যে তাহমিনা যবনিকা টানবে তা জাকি আশা করে নি। নরম সুরে তোক, চড়া সুরে হোক সে একটা বিহিত করতেই এসেছিল। কিন্তু তাহমিনার মুখোমুখি এসে সে যেন। কেমন খেই হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া এরপর, সে ভাবল, আর কিছু বলা বৃথা। উঠে দাঁড়াল। বলল, বেশ আজ থেকে মনে করবো আমাদের কোন বোন ছিল না। আমি চললাম।

তাহমিনা কোনো উত্তর করল না। যখন ও দরোজার কাছে গেল, তখন বলল, এরপর বাসায় বোধ হয় আমাকে যেতে দেবে না?

সে তোমার ইচ্ছে।

জাকি সিঁড়ি বেয়ে দুধাপ নামল। পাশে আলো জ্বলছে। জাকিকে একটু বেঁটে দেখাল ওপর থেকে।

মার খবর পাবো না?

তোমার দরকার কি?

আমার মার খবর দেবে না? যেতে দেবে না?

এ মুখ দেখিও না তাকে।

জাকি নেমে গেল। তাহমিনা দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির ওপরেই। একটু পরে সে শব্দ শুনল বেবি মরিস স্টার্ট নিচ্ছে।

.

একদিন সকালে ফারুক আবিষ্কার করল তাহমিনা কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। আশ্চর্য মন্থরতা তার চলনে। আর চোখ জোড়া আয়ত উজ্জ্বল। ফারুকের দিকে তাকাতে গিয়ে বারবার চোখ নামিয়ে নিল। বলনে কেমন চাপা খুশি, ফারুক লক্ষ্য করল। দুপুরে প্রায় সে ভুলেই গেল কথাটা। আর তার মনে রইল না।

রাতে যখন ফারুক ফিরে এলো তখন তাহমিনা এলিয়ে ছিল বিছানার ওপর। কাপড় বদলাতে বদলাতে ফারুক শুধালো, খেয়েছ?

না।

আজ দেরি যে বড়?

ভালো লাগছে না। তুমি খেয়ে নাও।

ফারুক খাটের কাছে এসে বসে বলল, কী হলো তোমার?

কিছু না।

তবে?

নাগো না, অসুখ করেনি। একদিন কি খারাপ লাগতে নেই? কী যে তোমার বুদ্ধি। যাওতো এখন।

ফারুক খেয়ে এসে শুয়ে পড়ল তার পাশে। তাহমিনা এপাশ ওপাশ করল খানিক। একবার গলায় বাহু জড়িয়ে দিল তার। মুখ লুকালো। পড়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আবার মুখ। তুলে নিল। ফারুক শুধালো, কিছু বলছ না মিনু।

উ।

আজ তোমাকে– কি হয়েছে তোমার?

তাহমিনা বালিশে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। ফারুক ওর চিবুকে হাত রেখে তাকাল। আবছা আলোতেও দেখতে পেল তার ঠোঁটে মিহি হাসির রেখা—- অদ্ভুত একটা ভাঁজ। সহসা তার মনে বিদ্যুতের মত নিমেষের জন্য একটা কথা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার হাত কাঁপল একটু।

তবে কি তাই মিনু?

হুঁ।

কবে টের পেলে? কিছু বলোনি?

আজকেই।

কী করে বুঝলে?

ও তুমি বুঝবে না। তারপর তাহমিনা তাকাল ফারুকের চোখে চোখে অন্ধকার। ফারুক তখন চোখ বুজেছে কিন্তু তা দেখতে পেল না তাহমিনা। সে তাকিয়ে রইল।

১৬. তাহমিনা চলে যাবার পর

তাহমিনা চলে যাবার দেড় বছর পর আবিদ এলো ঢাকায়। এই দীর্ঘ দেড় বছর সে কোথাও বেরোয় নি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছে। ব্যবসারও সমস্ত কাজ প্রায় ছেড়ে দিয়েছে আশরাফের হাতে। ভালো মন্দ সে যা করছে তাই ভালো। মাঝে মাঝে জরুরি কাগজপত্রে সই করে ও শুধু। আর মোটা টাকার দরকার হলে চেকে। তার উচ্ছল প্রাণ বন্যায় একটা পাথর চাপা পড়ে রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিরানন্দ দিন আর নীরব মুহর্ত। ডেক চেয়ারে বসে থাকাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার • খেতে খেতে কোনদিন মুখে গ্রাস তুলে হয়ত চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। আবদুল অস্বস্তি বোধ করে পাশে দাঁড়িয়ে। তবু হয়ত সে তেমনি চুপ করে ভাবছে। তারপর হঠাৎ চমক ভেঙে দ্রুত খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে আসে। আবদুলের দেখে শুনে ভালো লাগে না। কোন কোন দিন আশরাফকে সে ক্ষোভের সাথে বলে, হুজুর, এরচে আমাকে বিদেয় দিন, চলে যাই।

কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি সে চলে যায় না। সব সময় ছায়ার মত আবিদের সাথে সাথে থাকে। অনেক রাতে উঠে আবিদের কামরা দেখে আসে।

আশরাফও ভাবছিল এমন করে আর কদিন? দিনে দিনে আবিদের শরীর ভেঙে পড়ছে। অথচ জিগ্যেস করলে, বললে, কানই দেয় না। স্পষ্ট সে বুঝতে পেরেছিল, এমন করে বেশি দিন চললে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া কি নিয়ে ও বেঁচে থাকবে? কি তার অবন? এমন স্তব্ধ পাথর জীবন সে বইবে কী করে? একদিন আশরাফের মনে

হয়েছে যদি সে আত্মহত্যা করে। আফিয়াকে সে বলেছিল কথাটা। সেও সায় দিয়েছে, কিছুই বিচিত্র নয়। পরদিন আশরাফ বাংলোয় গিয়ে সব বন্দুক কিওরিও ঘরে রেখে তালা বন্ধ করে চাবি নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। শুধু একটা বন্দুক দিয়েছে আবদুলকে।

এটা তোর কাছে রাখবি। কাছছাড়া করবি না আর বাংলোয় আনবি না কখনো, তোর কামরাতেই রেখে দিস।

আবদুল একটু বিস্মিত হয়ে বলেছে, আচ্ছা।

কয়েকদিন পর আবিদ আশরাফকে বলেছে, রাইফেল সব বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, না?

তবে কি আবিদ সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল? আশরাফ চমকে উঠল। বলল, হ্যাঁ।

আবিদ একটু কাল তার দিকে তাকিয়ে তারপর হাতের বই ওলটাতে ওলটাতে বাইরের দিকে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলেছিল, আপনার ভয়, আত্মহত্যা করব। না করব না। এইখানে। একটু হাসল সে, তাহলে অনেক আগেই করতুম। যে মরেছে সে আবার মরে না।

মরে না ঠিকই, আবিদও হয়ত মরতে চায় না, তবুও আশরাফ দেখেছে দিনের পর দিন যে অযত্ন আর বিশৃঙ্খলা চলেছে তাতে মন্দ একটা কিছু হবার আশঙ্কা আছে পুরোপুরি। তাই একদিন আফিয়া আর খোকাকে সে নিয়ে এলো এ বাংলোয়। তারপর থেকেই আবিদের পুরোপুরি ভার আফিয়ার ওপর। ধীরে ধীরে সে ফিরিয়ে আনলো সংসারের শ্রী আর শৃঙ্খলা নিপুণ হাতে। আবিদের নাওয়া খাওয়ার ধরাবাধা সময় হলো। ইচ্ছেমত ডেকচেয়ারে বসে আকাশ পাতাল ভাববার তার আর অবকাশ বইল না। সে সময় আফিয়া কাছে এসে গল্প করতো। তাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইতো। বার থেকে দেখলে মনে হতো ঠিক আগের মতই আবার সব কিছু চলছে, শুধু একটু কাছে এলেই আজো অনুভব করা যায় সেই শূন্যতা। আফিয়া মাঝে মাঝে কথা তুলত। কিন্তু আবিদ আর আগের মত উড়িয়ে দিত না ম্লান হেসে, শুধু চুপ করে থাকত। তার এই নীরবতা দেখে একটু আশান্বিত স্বরে আফিয়া হয়ত বলে, তাহলে কবে যাবে বলো? নাকি খোকার আব্বা যাবে?

আমার ভালো লাগছে না ভাবী। আমি কিছু ভাবতে পারছিনে। একটু পরে আবিদ নিজেই শুরু করে, আচ্ছা ভাবী, তোমরা তো মেয়ে ওর কি একবারও আমার কথা মনে পড়ে না?

পড়ে বৈকি? দেখো, তুমি গেলেই আসবে। এদ্দিনে ভুল বুঝতে পেরেছে ও।

না, পড়ে না। আর ভুল বলছ কাকে? তুমি তো সব শুনেছ। না, না, ভুল ও হয়ত করে নি।

আফিয়া ইঙ্গিতটি বুঝতে পারে। নীরব হয়ে যায়। এরপরে তার আর কিছু বলবার থাকে না। আবিদ উদাস সুরে প্রায় নিজেকেই বলে, তুমিও পারলে না। বলো, এরপরেও আসবে? ও যেমন আছে তেমনি থাক, আমি গিয়ে অন্তরায় হবে না। হতে চাই না। আমি এমনিই বেশ আছি।

তোমাকে একটু কফি দিই, না?

দাও।

আফিয়া একটি ছল করে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে চায়।

১৭. কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা

কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। ফারুক তাই কদিন হলো আপিসে অত্যন্ত ব্যস্ত। দুপুরেই চলে যায়, আসে অনেক রাতে। সারা দুপুরটা তাই একেলাই কাটে তাহমিনার। তবু একেলা নয়। অনভিজ্ঞ নতুন মা–র হাজারো ব্যস্ততায় সময় তার গড়িয়ে যায় কখন। মাত্র চার মাস বয়স হয়েছে বাবুর ছেলেকে তারা আদর করে ডাকে বাবু—-তবু তারি দস্যিপনায় তাহমিনা অস্থির। দেখতে হয়েছে ঠিক তার মত। তেমনি গৌর, তেমনি নাকের গড়ন। সব কিছু তাহমিনার মতই। মাঝে মাঝে অপলক চোখে বাবুর দিকে তাকিয়ে এই সাদৃশ্য দেখে তাহমিনা।

আজ দুপুরে বাবু জেগে রয়নি তাকে বিরক্ত করবার জন্যে। কাঁদে নি। মাই খেতে খেতে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন দোলনায় শুইয়ে দিয়েছে তাকে। তারপর সেই ফাঁকে সেরে নিয়েছে নিজের নাওয়া খাওয়া। দুপুরে যাবার সময় ফারুক আয়নার সামনে শেষবার চিরুনি চালাতে চালাতে চাপা হাসি গলায় ডেকেছে, বাবুর মা, ও বাবুর মা।

বারান্দায় কী একটা কাজ করছিল তাহমিনা। হঠাৎ করে এমন একটা ডাক শুনে তার বুকের ভেতরে রক্ত ছাৎ করে উঠেছে। বলেছে, যাঃ।

আহা, শোনোই না ইদিকে।

ডাকটা নতুন আর কেমন মিষ্টি লেগেছিল তার কাছে। আর একবার শুনতে তার সাধ হলো। এসে বলল, কী বলছ শুনি?

আরো কাছে এসো।

কাছে আসতেই ফারুক একেবারে আড়কোলা করে তুলে বুকের সাথে চেপে ধরেছে।

দিন দুপুরে একি! ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।

ফারুকের এই খামকা ব্যবহারে তাহমিনা সত্যি সত্যি একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু সে ছাড়ে নি তবুও। চেপে ধরে গালের ওপর একে দিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে চুম্বনচিহ্ন

নাওয়া খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে দেখল, এখনো সেখানে ফিকে লাল আভা। ছি, ছি, ফারুকটা কী। এমন করে নাকি কেউ? বারান্দায় এসে সারা মুখ রগড়ে ধুয়ে ফেলল আবার। এরচে সারামুখ লাল দেখাক, তাও ভালো। তারপর বুলোলো একটু পাউডার প্রলেপ সেটা ঢাকবার জন্যে। তারপর বাবুর দোলনার পাশে বেতের একটা চেয়ার টেনে বসলো ছোট্ট একটা সেলাই হাতে করে। বাইরে স্নান হলুদ রোদে মন্থর প্লাবিত পথ। দুএকটা বাড়ির ছাদে বাতাসে কাঁপছে শাড়ি। আর কেমন নিস্তব্ধতা। ঠিক স্তব্ধ নয়, তবুও শব্দ নেই যেন কোনোখানে। টেবিল কাকে তিনটের ঘর পেরিয়ে গেল ঘণ্টাব কাঁটা। তাহমিনা এব বার অলস চোখ তুলে সময় দেখলো।

ঝি এসে বলল, আপামণি।

কিরে?

কে একজন ভদ্রলোক বাইরে নিচেয় দাঁড়িয়ে।

কে ভদ্রলোক? কাকে চায়?

জাকি নয়ত? লাবলু নয়ত? কে এলো এখন! ফারুকের কাছে তো কেউ আসে না বড় একটা। আর এমন উদ্বিগ্ন হলো কেন সে খামোকা? ঝি উত্তর করলো, আপনার কথাই বললেন।

আমার কথা? নাম বললেন?

না।

হয়ত নাম শুনে আসবার জন্যে ঝি দরোজার দিকে পা বাড়ালো, এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে কার উঠে আসবার শব্দ শোনা গেল। তাহমিনা উঠে বারান্দায় এসে দেখলো আবিদকে! আবিদ একটা ধাপের ওপর পা রেখে দেখল তাহমিনাকে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। তাহমিনা অস্ফুট স্বরে বলল, তুমি!

আবিদ কিছু একটা বলতে গিয়ে পারল না। একবার মাথা কুঁকালো শুধু অস্পষ্ট ভঙ্গিতে।

তাহমিনার মনে হয়েছিল প্রথমে, এই যে মানুষটা তার চোখের সমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সে কোনদিনও চিনতো না। দীর্ঘ সেই মানুষটার দেহ কী এক ক্লান্তির ভারে নুয়ে এসেছে যেন ঈষৎ। পরনে ছাই ছাই স্যুট—-তাতে আরো ম্লান আরো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। আর কী অসম্ভব স্থবির তার উপস্থিতি। বাঁ হাতে শিরা ফুটে উঠেছে দৃঢ়তায় নয়, দৌর্ব্বল্যে। হয়ত তাই। একটা রেখার মত, একটা অবাস্তব অথচ অনস্বীকার্য উপস্থিতির মত, পৃথিবীর। আতঙ্কের মত ওই মানুষটার আশ্চর্য উপস্থিতি।

তাহমিনা তেমনি অস্ফুটস্বরে, কেন না এর চেয়ে উঁচু পর্দা তার এখন এলো না, উচ্চারণ করল, এসো।

কিন্তু শোনা গেল না বুঝি তার সেই স্বর। কেননা আবিদ এতটুকু নড়ল না তার অবস্থান বিন্দু থেকে। পরে তাহমিনা এক পা পেছুলো, মুখ করলো তার কামরার দিকে। আর তখন আবিদ উঠে এলো একেকটা সিঁড়ি অনেক সন্তর্পণে মাড়িয়ে, রেলিংয়ে বাম করতাল ছুঁইয়ে চুঁইয়ে। নিঃশব্দে দুজনে গিয়ে ভেতরে বসলো। চৌকাঠে পা রেখেই আবিদের চোখ পড়েছিল দোলনার ওপরে। সে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এক মুহূর্তের জন্যে। প্রথমে কিছুটা বিস্ময়, তারপর একটা চাপা হিংস্রতা যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এক ধরনের তীব্র হিংসায়। নীল ধ্বক ধ্বক করল তার চোখ।

আর তাহমিনা হয়ত সে সময়ে আর্ত চিৎকার করে উঠতো। কিন্তু ওঠেনি। সে চাইল বাবুকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে। ভীষণ একটা ভয় ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল। ভাবল, আবিদ কি করবে এর পর? এদ্দিন বাদে কেন সে এলো ঢাকায়? যদি কিছু একটা অনর্থ বাধিয়ে ফেলে আজ, এখুনি! তাহলে কী সে করবে? দেড় বছর ধরে যে সাহস ছিল তার চোখে এখন এক মুহূর্তে তা ভীরু হয়ে গেল। আবিদ যদি কোনদিন তার মুখোমুখি হয়, সে ভেবেছিল, কিছুই সে হতে দেবে না। হার মানবে না। অথচ আজ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে শুধু অসহায় লাগল তার নিজেকে। একটু আগেই সে আবিদের চোখে দেখেছে হিংসার নীল আভা; সে কথা ভেবে পর মুহূর্তেই কঠিন হয়ে এলো তাহমিনা। ঋজু শান্ত ভঙ্গিতে আবিদকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল একটু দূরে।

আবিদের সহসা ভীষণ তীব্র একটা সাধ হলো বাবুকে দেখবার। তার মনে হলো দোলনার ওপর শুধু ঘুমিয়ে থাকা এক শিশু নয়, তার চেয়ে আরো কিছু বেশি এবং অন্য কিছু সে দেখতে পাবে। তাহমিনার গর্ভে যে সন্তানের জন্ম, তার মুখের আদল কেমন, তা সে দেখতে চায়। কিন্তু তাহমিনার সেই ঋজু ভঙ্গি তাকে বিহ্বল করে দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বসলো চেয়ারে। তারপর শরীর এলিয়ে দিল অলস ভঙ্গিতে।

সমস্ত কামরায় এখন তীব্র নিস্তব্ধতা। কেউই শুরু করল না প্রথমে কোনো কথা। কিন্তু দুজনেই যেন বুঝতে পারল এ ভারী অশোভন হচ্ছে। তাই দুজনেই চাইল একটা কিছু বলতে। অনেকক্ষণ পরে, প্রথমেই তাহমিনা, কবে এসেছ?

কামরার দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাহমিনা। তার স্বর যেন তীরের মত বিদীর্ণ করল সহসা এই স্তব্ধতাকে। আবিদ চোখ তুলে উত্তর করল, কাল। যেন যথেষ্ট বলা হল না, এই ভেবে সে আবার বলল, কাল ভোরে। হোটেলে উঠেছি।

ও।

তাহমিনা উচ্চারণ করল না, একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। তারপর সেও বসল একটা চেয়ারে আস্তে আস্তে পিঠ ধরে। আবিদেব বসে থাকা ভঙ্গি দেখে সহসা তার মনে হলো যেন লাফ দেবার পূর্ব মুহূর্তে একটা বাধ ওঁৎ পেতে বসে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্ধের মত। তাহমিনা বলল, কেন তুমি এলে?

আবিদ এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, এমন করে চলে এলে কেন তাহমিনা? আমাকে বললে না, কাউকে বললে না। ফারুকের কথা আমি জানতামও না। আমি হাসপাতালে, শেষবার দেখাও করলে না।

আবিদের প্রত্যেকটা বাক্যের ভেতরে বেশ কিছুটা করে যতি। অনেক বড় কোন কথার যেন মাঝখান থেকে তুলে তুলে সে বলে গেল। তবু তাহমিনা বুঝতে পারল স্পষ্ট, কী সে বলতে চাইছে।

সে শান্ত গলায় বলল, আমার এ ছাড়া কোনো পথ ছিল না।

আবিদ একটুকাল তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর, কিন্তু আমার সাথে তোমার বিয়ে হয়েছিল। আমি তোমার স্বামী। কথাটা বলে নিজেই যেন চমকে উঠল সে। নতুন কথার মত শোনাল তার নিজেরই সংলাপ। আর এন তাহমিনার দিকে ভালো করে তাকিয়ে সে অনুভব করল, তাহমিনা তার কত দূরে সরে গেছে। তাকে সে আর স্পর্শও করতে পারবে না। এমনি দূর।

তাহমিনার কানে এই আমি তোমার স্বামী বাজলো একটা তীব্র ধাতব সংঘাতের মত। সে চুপ করে রইলো। আবিদ হঠাৎ আঙ্গুল তুলে শুধালো, খোকা?

হ্যাঁ।

কী নাম?

বাবু।

ও কোথায়?

আপিসে।

তাহমিনা অপেক্ষা করছিল, হয়ত আবিদ এখুনি দোলনার কাছে এগিয়ে যাবে। তার মনে হলো হয়ত একতাল মোমের মত দুহাতে তুলে পিষে ফেলবে বাবুকে। একটা তীক্ষ্ণ

শংকা তাকে বিদ্ধ করল। কিন্তু আবিদ উঠলো না, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল দ্রুত। তাহমিনা আশ্চর্য রকমে ব্যথিত হলো। সে যদি তা করত, তাহলে কি সত্যি সত্যি সে খুশি হতো? হঠাৎ আবিদ স্বর পালটে নরম গলায় বলল, তাহমিনা, একটা কথা তোমায় বলব?

বলো।

কেন তার কণ্ঠ এমন কোমল হলো? না না। নিজেকে মনে মনে অভিশাপ দিল তাহমিনা।

অবিশ্যি জানিনে বলবার মত দাবি আমার এখনো আছে কিনা, তাই প্রথমেই জিগ্যেস করে নিলুম।

আবিদ কী কথা বলতে চায় যে যার জন্যে এত ভূমিকার প্রয়োজন? প্রথমে যে দুর্বলতা তাকে ভর করেছিল, এখন আর তা নেই। মনে মনে কঠিন হলো সে। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগল তার মনে। অথবা জাগলেও তা এত ক্ষীণ যে সে বুঝতে পারল না। তার চোখে ফুটে উঠল চাপা উপেক্ষার বিদ্যুৎ।

এমন করে আর কদ্দিন তাহমিনা? নিজের বৌ চলে গেলে লোকে কত কথা বলে, সেটা ভাবলে না? এমন করে তুমিই বা কী করে থাকবে? সমাজের স্বীকৃতি ছাড়া? আমি তোমাকে কোনদিন কি ভালোবাসিনি? তোমাকে আমি আজো ভালোবাসি। দেড় বছর ধরে শুধু ভেবেছি, শেষ অবধি দেখেছি তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। তুমি চল।

আর ফিরবার পথ নেই আমার।

নেই?

না। আর সমাজের কথা বলছ? ইচ্ছে হলে আইনে যেমন করে হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেই খুশি হব।

সেতো দেড় বছর আগেই হয়ে গেছে। আইন আর এদ্দিনে আমি তুলবো না। তাছাড়া মনের একটা নিজস্ব আইন আছে। তাকে সম্মান করতে জানি।

তাহমিনার মনে হলো একটা সম্পূর্ণ নতুন মানুষের সঙ্গে সে কথা বলছে যেন। এমনকি কথা বলবার ভঙ্গি কত বদলে গেছে আবিদের। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনলো তার সংলাপ। আর কী আশ্চর্য, এমন কী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এই বাচন ভঙ্গির পরিবর্তন তার মনে এক শিশু কৌতূহলের জন্ম দিল। সে ভালো করে তা বুঝতে পারল না, যেন এই কৌতূহলের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, আপনা আপনি একটি সুন্দরের মত তা গড়ে উঠল।

তাহমিনা প্রশ্ন করল, তাহলে কেন তুমি এলে?

তোমাকে নিয়ে যেতে।

আমি এখন মা, আর তা হয় না। যদি আমাকে কোনদিন ভালোবেসে থাকো তাহলে বাবুর জন্যে তুমি পাকাপাকি বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কোরো। তুমি এসেছ, না হলে হয়ত নিজেই লিখতুম তোমাকে।

লিখতে? আমাকে?

হ্যাঁ। বাবুর ভবিষ্যৎ আমি ভাববো না?

আবিদ কোনো কথা বলল না। সে জানল, তাহমিনার সন্তান আজ তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহমিনা কোন দিন এমন করে বলতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি। দুরাশা ছিল, হয়ত মুখোমুখি দাঁড়ালে সে আর না করতে পারবে না, ফিরে আসবে। সে কথা আফিয়াও বলেছিল, দেখো তুমি নিজে গেলে, ও কিছুতেই না এসে পারবে না। হাজার হোক তুমি ওর স্বামী তো।

উত্তরে সে বলেছিল, কিন্তু যদি সে না আসে, তাহলে আমি ছোট হয়ে যাব যে ভাবী। এখন তবু প্রায় ভুলে গেছি, আর কিছুদিন পরে হয়ত মনেই থাকবে না, সেই ভালো। মাঝখান থেকে চোখে দেখে ক্ষতটাকে বাড়াতে চাইনে ভাবী।

আফিয়া মনোযোগ দিয়ে শুনে তারপর বলেছে, এ তোমার মিছে ভাবনা। ও আসবেই, না এসে পারে না।

না, না।

আফিয়া এবার অভিমান করে স্নেহের রাগে গলা ভিজিয়ে বলেছে, আমি তোমার সংসার কদ্দিন দেখব? আমি মরে গেলে?

মরবার বয়স আপনার হয়নি।

তবুও তো। তোমার নিজের লোক থাকতে তুমি এমন করে কষ্ট করবে কেন?

আবিদ উত্তর করেছে, কষ্ট আমার কিছু নেই, বেশ আছি। আর আপনি যেতে চাইলে আমি ছাড়ব কেন?

না, না, তুমি ঢাকায় যাও। তুমি ওর সাথে দেখা করো।

আবিদও কিছুদিন হলো কথাটা ভাবছিল। নতুন করে অনুভব করেছিল তাহমিনার অনুপস্থিতি আর বুকের শূন্যতা। তীব্রতর হয়ে উঠেছিল তাকে কাছে পাবার বাসনা। প্রতিটি মুহূর্ত, তাহমিনা নেই এই কথা গুমরে মরেছে তার ভিতরে। নিজেকে মনে হয়েছে আরো অসহায়। প্রথম সেই আঘাতের পর জোর করে কিছু দিন তাকে ভুলে ছিল, কিন্তু শেষ অবধি তা পারে নি। আফিয়া যতক্ষণ কাছে কাছে থাকে, ততক্ষণ কিছুই মনে হয় না তার। কিন্তু সে একটু দূরে সরে গেলেই তার একাকীত্ব সে অনুভব করতে

পারত ভয়াবহভাবে। সে জানে তাহমিনা কেন চলে গেছে, কি সে পায়নি; তবু অভিমান হতো সে কেন চলে গেল বলে। সে কি থাকতে পারত না? তার নিষ্ফল নির্বীজ জীবনে যে সামান্য শেষ ভালোবাসাটুকু ছিল সম্বল, তাকে সে উপড়ে দিয়ে গেল কেন? শুধু তাকে, সে ভালোবাসতে পারত না? সমস্ত অভিযোগ সব অভিমান দলা পাকিয়ে বুকের ভেতরে ভারী হয়ে কণ্ঠনালী রুদ্ধ করে দিতে চাইত।

সবাই যখন শুয়ে পড়ে, তখন শোবার ঘরে আবিদের ঘুম আসে না কিছুতেই। বিরাট খাটের শূন্যতার ওপর এপাশ ওপাশ করে শুধু ও। আনমনে, কিংবা দুরাশায় চোখ বুজে পাশে হাত বুলোয়, হয়ত তাহমিনার দেহগর্শ ঠেকবে এই ভেবে। কখনো কখনো শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। খালি পায়ে পায়চারি করে কার্পেটের ওপরে। নিরর্থক তাকিয়ে থাকে ছোট করে রাখা বেডল্যাম্পের দিকে। তারপর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ মেলে দেয়। সহসা মুখ ফিরিয়ে বলে তুমি কেন গেলে তাহমিনা?

যেন তাহমিনা এ কামরাতেই আছে শুনতে পাবে।

দিনে দিনে তাহমিনার অভাব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল তার কাছে। সে বুঝেছিল, তাহমিনাকে ছাড়া তার বেঁচে থাকা নিরর্থক। তার ভালোবাসা তার কাম্য। সে তাহমিনাকে ফিরিয়ে আনবেই।

ঢাকায় এসে জাকিদের বাসায় ওঠেনি। হোটেলে গেছে। মালেকাবাণুর সাথে দেখাও করে নি। দুপুরে গেছে জাকির আপিসে। বাইরে সেই মরিস দাঁড়িয়ে আবিদের মনে পড়েছিল

বিয়ের পর সে আর তাহমিনা এই কারে করেই গিছল নারায়ণগঞ্জে। স্টিমারঘাট অবধি। এগিয়ে দিতে এসেছিল সবাই। পাশে ছিল লিলি। জাকি ড্রাইভ করছিল। আর লাবলু তার পাশে। কামাল সাহেব আর মালেকাবাণু বাড়িতেই ছিলেন। আর মনে পড়ল স্টিমারের ডেকে বসে অন্ধকার আকাশে দুজনের তারা দেখার কথা। একটা তারার ভুল নাম বলেছিল সে। তাহমিনা শুধরে দিয়েছে, ওটা কাল-পুরুষ।

জাকি ওকে যেন ঠিক আশা করতে পারেনি। দেড় বছর হয়ে গেল যে আসেনি, চিঠি দিয়েছে খুব কম, সে যে এমন করে হঠাৎ এসে পড়বে তা সে ভাবতে পারেনি। প্রথম দেখার উচ্চসটা জাকির কমে এলে পর আবিদ নিজেই জিগ্যেস করেছে তাহমিনার কথা। উত্তরে ও বলেছে, যা হয়ে গেছে তারপর থেকে ওকে আমি নিজের বোন বলে আর স্বীকার করতে পারিনি। আমরা মনে করি, তাহমিনা মরে গেছে।

আবিদ চুপ করে শুধু পেপারওয়েট আঙুলে ঘুরিয়েছে টেবিলের রেকিসন জমিনে। তারপর জাকি একটু থেমে বলেছে বেশ কিছুদিন আগে একটা খবর পেয়েছিলুম ওর নাকি ওর নাকি ছেলে হবে। কাউকে বলিনি বাসায়। শুনলে মা আরো দুঃখ পেতেন।

ও অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করেছে, ছেলে!

তারপর নিজেই মাথা নেড়েছে না অবাক হবার কী আছে।

সেই জাকির কাছ থেকেই নিয়েছে সে ঠিকানা। তাহমিনা সন্তানবতী, এদ্দিনে হয়ত সে মা। কেমন নতুন নতুন ঠেকল কথাটা। তাহমিনা যখন মা, তখন তাকে দেখাবে কেমন?

দেখতে সেই দেড় বছর আগের মতই। শুধুমাত্র পরিবেশটা ভিন্ন। কিন্তু ভেতরে যে কতখানি বদলে গেছে, সম্পূর্ণ সে আলাদা হয়ে গেছে, তা বুঝতে পারল যখন তাহমিনা উচ্চারণ করল —-বাবুর ভবিষ্যৎ আমি ভাবব না? এখন তার আর তাহমিনার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে ফারুক নয় বাবু। আবিদ উচ্চারণ করল, আমার কথা তুমি ভাববে না? একটু থেমে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি তাহমিনা। তুমি কি কিছুতেই যেতে পার না?

এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে তাহমিনা? এ কথার কোনো উত্তর দেয়া যায় না। তাহমিনা তাই চুপ করে বসে রইল। তার চোখ আনত হলো কোলের ওপর। আবিদ আসবার সময় ভেবেছিল যেমন করেই হোক তাহমিনাকে সে ফিরিয়ে আনবেই। কিন্তু এসে অবধি সেই দৃঢ়তা সে তার স্বরে, তার ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে পারল না। শুধু একটি অবোধ্য আকুতি হয়ে রইল তার সমস্ত কথা। এখন সে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইল।

১৮. জানালার পর্দা সরানো কিছুটা

জানালার পর্দা সরানো কিছুটা। একটুকরো আকাশ, কয়েকটা বাড়ির মাথা দেখা যায়। দূরে একটা ছাদে শাড়ি শুকোতে দিয়েছে কেউ। আর পাতাবহুল নিমের ঘন ডাল। এতক্ষণ রোদে চিকচিক করছিল নতুন পাতাগুলো। এখন পড়তি রোদের ম্লান কোমল আলোয় শুধু বেগুনি হয়ে রয়েছে। আবিদ সেদিকে মুখ ফেরালো। তারপর উঠে গেল জানালার ধারে। সরিয়ে দিল পর্দাটা একপাশে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট ধরালো। প্রথম কাঠিটা নিভে গেল জ্বলে উঠেই। ধরলো দ্বিতীয়টা।

বাবু ঘুম থেকে উঠেছে অনেকক্ষণ। তাকে কোলে করে বারান্দায় এসেছিল তাহমিনা। তারপর শান্ত করবার জন্যে মাই দিয়েছিল খানিক মোড়ায় বসে। এতক্ষণ আবিদ বসে ছিলো ভেতরে। বার থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যায় নি তার। চেয়ার টানবার কী গলার কোনো আওয়াজ শোনা যায় নি। চট করে বোঝা যাবে না যে ভেতরে কেউ আছে। তাহমিনারা ও কেমন মনে হয়েছিল, আবিদ যেন আদৌ আসে নি। শুধু একটি মুহূর্তের জন্য বারান্দায় বসে। মাই ওর মুখে তুলে দিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা দুরু দুরু লজ্জার কাঁপন লেগেছিল তার সারা শরীরে। এমন কোনো দিন হয়নি। বাবু হবার পর একদিনও না। আজ হঠাৎ সে অনুভব করেছিল, সে মা। আজ সেই অনুভবটুকু শিথিল করে দিয়েছে তার সমস্ত শরীর। তাহমিনা যেন এক নিমেষে বদলে গেছে।

তারপর বাবুর অস্পষ্ট ভুরুতে দিয়েছে গভীর কাজলের রেখা। ঘরে এসে পাউডার দিয়ে বুলিয়েছে তার ছোট্ট কোমল শরীর। তারপর নিচেয় নেমে ঝির কোলে দিয়ে বলেছে ও

বাসায় বেরিয়ে আসতে। পাশের বাড়ির বৌটির দিনে অন্তত একবার বাবুকে কোলে নেয়া চাইই। অন্য দিন হলে তাহমিনা নিজেই যেতো। হয়ত গল্প করত খানিক। কিংবা হয়ত বৌটি আসতো নিজেই। আজ বাবুকেই পাঠিয়ে দিল সে। আর কেন যেন সেই মুহূর্তে ভাবলো, ও বাসার বৌ যেন আজ ঈশ্বর করুন না আসে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে কামরায় দাঁড়াতেই তাহমিনার মনে হলো, কেন সে সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দূরে সরিয়ে একেলা হতে চাইলো? আর এখন আবিদের মুখোমুখি এই একেলা হওয়াটা কী ভীষণ! সে অনুভব করল। সে ভাবলো। চুপ করে রইলো।

আবিদ তখনো সেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। তাহমিনা সেদিকে স্থির তাকিয়ে চোখ তার আবিদকে ছাড়িয়েও তারো দূরের শূন্যতায়। হঠাৎ যেন কী একটা ক্ষরিত হয়ে যাওয়ার অদৃশ্য শিহরণ জাগলো তার আত্মায়। যেন একটা শক্তি অপসারিত হলো তার চেতনা থেকে। একটা একটা করে আশেপাশের একই চোখে দেখা বস্তুগুলো মিলিয়ে গেল দৃষ্টির অতীতে। তাহমিনার শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে।

একি হলো তার? না–না–ওকথা নয়। এ সে কিছুতেই হতে দেবে না। কোন মূল্যে কোনদিনই নয়।

তাহমিনা জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল আবিদের শরীর থেকে। কিন্তু পারল না। আগের চেয়ে, এই প্রথম তার চোখে যেন পড়ল, অনেক কৃশ হয়ে গেছে আবিদ। আর

ওর ডান পায়ে কি সেই দুর্ঘটনার চিহ্ন এখনো আছে? ও কেন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে? ক্ষোভ হলো ঈশ্বরের ওপর, কেন তিনি ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন না?

হঠাৎ চমক ভাঙল তার, এ কি ভাবছে সে? এ কথা তো স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবতে চায় নি। চিরদিনের মত সে ভুলে যেতে চেয়েছিল সেই ব্যর্থ দিনগুলোর ইতিহাস। কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইলো তার আত্মা। আত্মার গভীর থেকে কে যেন কেবলি অশান্ত পাশ ফিরছে তাকে আরো অশান্ত করে দিয়ে।

একটু কেঁপে ওঠা গলায় জোর করে সে উচ্চারণ করল, তুমি চলে যাও। চলে যাও।

ঘুরে দাঁড়াল আবিদ। যেন সে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এই কথারই অপেক্ষা করছিল।

না–না তোমার পায়ে পড়ি আবিদ–

আর সে বলতে পারল না, কিম্বা বলবার হয়ত এরপর কিছুই নেই তার। তাহমিনা ছুটে গিয়ে বিছানায় বালিশে মুখ লুকোলো। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কেন–কেন সে তাদের দুজনকেই ভালোবাসতে পারে না? ফারুক আর–আর আবিদ। তার সমস্ত হৃদয় যেন কথা হয়ে তার অবাধ্য এই কণ্ঠের আশ্রয় মিনতি করলো–আবিদ, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আবিদ, আমি তোমারই। একটুপর এক আশ্চর্য নির্ভরতার মত তাহমিনা তার কান্নাশরীরে অনুভব করলো আবিদের কম্পিত করতল।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
মার্চ ১৯৫৬